৮.১০ আরাকানে দস্যু বনহুর – Bangla Library

৮.১০ আরাকানে দস্যু বনহুর – Bangla Library

৮.১০ আরাকানে দস্যু বনহুর

আরাকানে দস্যু বনহুর –১৩০

অজানা-অচেনা বালুকাময় প্রান্তরে কয়েকটা দিন কেটে গেলো বনহুর, রাণী আর মাসুমা রিজভীর। সমস্ত দিন ওরা সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হয় কোনো জাহাজের দেখা মেলে কিনা। কোনো কোনো দিন চলে যায় দূরে বহু দূরে গভীর জঙ্গলে। সমুদ্রতীর ছেড়ে অনেক দূরে গহন জঙ্গলে। মাঝে মাঝে জলাশয় এবং ছোট ছোট পাহাড় জাতীয় টিলা।

জঙ্গলটিতে কোনো মানুষের পদক্ষেপ পড়েছে কিনা সন্দেহ। জলাশয়গুলোতে নানা ধরনের জলীয় উদ্ভিদ আর আগাছা ভরা।

হেলিকপ্টারে যে পানীয় এবং শুকনো খাদ্যদ্রব্য তারা পেয়েছিলো তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সামান্য কিছু শুকনো পাউরুটি আর বিস্কুট ছাড়া কিছু নেই।

ওরা তিনজন। এই জনপ্রাণীহীন বালুকাময় প্রান্তরে তারা পানি ও খাবার ছাড়া বাঁচবে কি করে! তরুণী মাসুমার করুণ অবস্থা বিচলিত করে তোলে দস্যুরাণীকে। সে নিজের জন্য তেমন করে ভাবে না, ভাবনা সব ওর জন্য। মেয়েটিকে তারা উদ্ধার করেছে নরপশুদের কবল থেকে কিন্তু তার যে অবস্থা তাতে তাকে আর কদিন বাঁচাতে পারবে তারা। একে বস্ত্রহীন, তারপর খাদ্য নেই পেটে, রুক্ষ চুল, চোখের নিচে কালিমা পড়েছে, দৃষ্টিতে তার অসহায় চাহনি।

দিনের আলোতে সূর্যের তাপে শরীর জ্বালা করে, তখন তারা তাদের আশ্রয়স্থল হেলিকপ্টারে আশ্রয় গ্রহণ করে। দিনের আলোতে দূরে অনেক দূরে চলে যায় তাদের দৃষ্টি, কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে ওরা, পাখিগুলোর মত যদি তাদের ডানা থাকতো তাহলে তারা উড়ে চলে যেতো তাদের ইচ্ছামত যেখানে খুশি সেখানে। কখনও বা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ নয়নে। একটি জাহাজ যদি এসে পড়তো ভুল করেও এদিকে তাহলে তারা ফিরে যেতে পারতো।

আজ তারা অসহায়।

সেদিন খাদ্যের সন্ধানে ওরা তিনজন এগিয়ে চললো জঙ্গলের দিকে। যদি কোন ফলমূল পাওয়া যায়। কিংবা কোন জলাশয় আছে কিনা, খাবার পানি প্রায় শেষ।

ওরা তিনজন এগিয়ে যাচ্ছে।

বনের কাছাকাছি পৌঁছে বিশ্রামের আশায় একটি বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো ওরা। মাসুমা রিজভীর মুখমন্ডলে দারুণ ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিলো।

বনহুর বললো–মিস রিজভী, আপনারা বসুন এবং বিশ্রাম করুন আমি দেখছি আশেপাশে কোনো জলাশয় আছে কিনা।

রাণী বললো–ওকে তুমি থেকে একেবারে আপনি সম্বোধন ব্যাপার কি বলো তো।

হাসলো বনহুর, তারপর শান্ত গলায় বললো–হয়তো অন্যমনস্ক অথবা কার্যক্রমে তুমি সম্বোধন করেছি কিন্তু উনি একজন সুশিক্ষিত মহিলা, তাকে আপনি বলাই শ্রেয়। কারণ আমার প্রতি উনি ক্ষুণ্ণ হতে পারেন।

মাসুমা রিজভীর অসহায় করুণ মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠলো, সে বললো–আপনারা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কাজেই তুমি বললেই আমি বেশি খুশি হবো।

রাণী বললো–হা, আমরা ওকে তুমি বললে সে বেশি খুশি হবে এটা আমি জানি।

বেশ তাই হবে। বললো বনহুর।

বনহুর পা বাড়াতেই রাণী বললো–চলো আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

বনহুর বললো–ওকে একা রেখে উভয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না। বরং তুমিও ওর পাশে বসে বিশ্রাম করো।

তুমি একা যাবে বনহুর।

তাতে ভাববার কিছু নেই। কথাটা বলে বনহুর বিদায় গ্রহণ করলো।

রাণী বৃক্ষের ছায়ায় বসে বললো–বসো বোন মাসুমা।

মাসুমা বনহুরের দিকে তাকিয়ে ছিলো, সে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে চলে যাচ্ছে বনের দিকে। ভাবছে সে লোকটা শুধু সাহসীই নয়, তার সুকৌশল বুদ্ধিমত্তার জন্যই ঐ পাপিষ্ঠ শয়তানদের কবল থেকে দেহ রক্ষা পেয়েছে। রক্ষা সে পেলো বটে কিন্তু তার নারী জীবন যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। হারিয়েছে সে সবকিছু। তার ফুলের মত জীবন আজ কলংকের কালিমায় কলুষিত। যদি সে কোনো রকমে তার পিতা-মাতার পাশে ফিরে যেতে পারে তাহলে তারা কি সেই পূর্বের মাসুমা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। হয়তো বাবা-মা কন্যা হিসেবে বুকে তুলে নেবেন কিন্তু সমাজ? সমাজ কি তাকে আশ্রয় দেবে, সবাই জানে তাকে দুস্কৃতিকারিগণ অপহরণ করেছে। জাহাজে নিয়ে আসার পূর্বে শয়তানদের কেউ তাকে কয়েকটি পত্রপত্রিকা দেখিয়েছিলো। তখন মাসুমা অশ্রুসিক্ত নয়নে পড়ে দেখেছিলো সেই সংবাদ পত্রিকার সংবাদগুলো। আরাকান শহরের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী মিঃ মনিরুর রিজভীর এক মাত্র কন্যা মাসুমা রিজভী অপহৃত...শিরোনাম পড়ার পর আর কিছু পড়ার মত মনোবল তার তখন ছিলো না। শুধু একটি সংবাদপত্রই নয়, অনেকগুলো পত্রপত্রিকায় এ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিলো। মাসুমার চোখের সামনে পিতার অসহায় করুণ মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে বারবার। মায়ের অশ্রুভরা মুখমন্ডল তার মনে কুঠারাঘাত করেছে। কেঁদে বুক ভাসিয়েছে কিন্তু কেউ তাকে সমবেদনা জানায়নি। মুক্তির বিনিময়ে মাসুমা তার সব অলংকার এবং যা কিছু অর্থ তার বাবার আছে সব সে তাদেরকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবুও রেহাই পায়নি সে।

মাসুমার হাত ধরে রাণী বসিয়ে দেয়, তারপর বলে-অমন করে কি ভাবছো বোন?

বললো মাসুমা–কিছু না।

তোমার চোখমুখ বলছে তুমি গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছো। বলল তোমার যা বলার থাকে আমাকে বলে?

মাসুমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–সবই তো বলেছি আমি।

জানি তোমার মনে অনেক ব্যথা, জানতে চাই যদি কোনো সূত্র বেরিয়ে আসে তোমার কথা থেকে। জানো মাসুমা, আমাদের সঙ্গীটি অসাধারণ পুরুষ। সে তোমাকে তোমার পিতার হাতে পৌঁছে দেবেই যেমন করে থোক এ বিশ্বাস আমার আছে। আমিও তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

মাসুমা হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে নিয়ে বললো–আমি চিরকৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে! সত্যি, এই বিপদ মুহূর্তে আপনারা যদি আমাকে উদ্ধার না করতেন তাহলে আমার মৃত্যু ঘটতো এতক্ষণে। বোন, আপনি জানতে চাইছেন আমার ব্যথার কথা। যদি আমার কথা থেকে আপনারা কোন সূত্র পান সেই শয়তান পাপিষ্ঠদের সায়েস্তা করার, সেই কারণে। তাই না?

হ্যাঁ, তোমার অনুমান সত্য বোন। আমি এবং আমার সঙ্গী তোমাকে যেমন করে হোক তোমার পিতামাতার নিকটে পৌঁছে দেবো, তারপর……দাতে দাঁত পিষে বললো রাণী-তারপর সেই পাপিষ্ঠ নরপশুদের কেমন করে শাস্তি দিতে হয় তাই করবো।

সত্যি আপনারা পারবেন। এ বিশ্বাস আমার কাছে। শুধু আপনার সঙ্গীটিই অসাধারণ নন, আপনি নিজেও অসাধারণ তা আমি বেশ অনুধাবন করেছি। আপনি নারী হয়েও হেলিকপ্টারটিকে যেভাবে চালাচ্ছিলেন তা বিস্ময়কর। আপনার সুকৌশল চালনার জন্যই আপনার সঙ্গী আমাকে সেই জাহাজ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। একটু থামলো মাসুমা, কথা বলতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। তবুও সে বলে চললো-আমাকে মাফ করবেন। আমি স্বাভাবিক চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম তাই আপনাদের জ্ঞানী-গুণী জনদের তুমি বলে সম্বোধন করেছি। আর আমি আপনাদের তুমি বলতে পারবো না।

হেসে বললো রাণী-বেশ, তোমার যা খুশি তাই বলল। হ্যাঁ, কি বলছিলে তোমার কথা……

বলছিলাম আর আমার ফিরে গিয়ে কি হবে, কারণ কলংকের কালিমায় আমার জীবনের সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি কলংকিতা….ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মাসুমা রিজভী।

এমন করে কাঁদলে কোনো ফল হবে না মাসুমা। জীবনে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয় আর বিপদকে জয় করাই হলো মানুষের কাজ।

মাসুমার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু! অধর দংশন করে সে, তার মনের যন্ত্রণাকে সে সংযত করে নেয়ার চেষ্টা করে।

এখানে যখন রাণী আর মাসুমা কথা হচ্ছিলো তখন বনহুর বনের মধ্যে প্রবেশ করে সন্ধান করে ফিরছে, কোন সুস্বাদু ফল আছে কিনা। অথবা কোন জলাশয় নজরে পড়ে কিনা।

অগ্রসর হচ্ছে তো হচ্ছে বনহুর। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে, দৃষ্টি তার চারদিকে। হঠাৎ একটা শব্দ কানে ভেসে আসে তার। জলপ্রপাতের ক্ষীণ শব্দ। আশায় আনন্দে মন তার দুলে ওঠে, এ শব্দ জলপ্রপাতের ছাড়া কিছু নয়।

বনহুর সেই শব্দ লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছে।

আরও গভীর বন।

দিনের আলোতেও সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় মনে হচ্ছিলো। বনহুর যতই এগুচ্ছে ততই শব্দ স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। বনহুর ভাবলো ফিরে গিয়ে রাণী আর মাসুমাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। কিনা। না তার পূর্বে সে নিজেই চাক্ষুষ দেখে যাবে সত্যি কোন জলপ্রপাতের শব্দ না অন্যকিছু।

শব্দ লক্ষ্য করে বহুদূর চলে এলো বনহুর।

গভীর অন্ধকার কিছুটা হালকা মনে হচ্ছে এবার। সূর্যের আলোকরশ্মি বনের মধ্যে একটা মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বৃহদাকার বৃক্ষের পাতার ফাঁকে সূর্যের আলো পড়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। বনহুর ভাল করে তাকালো, দেখছে সে শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো দূরে, বেশ দূরে একটি ধবধবে সাদা অট্টলিকা। অট্টালিকাটি একটি উঁচু স্থানে, তারই ভেতর থেকে একটি জলপ্রপাত গড়িয়ে এসে নীচু খাদে গিয়ে পড়ছে। তারই শব্দ এতক্ষণ কানে পৌঁছলো। খুশিতে বনহুরের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যেমন খুশি হলো তেমনি বিস্মিত হলো সে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এতো সুন্দর মনোরম অট্টালিকা এলো কি করে। বনহুর বাড়িটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, ভাবছে বাড়িটির দিকে অগ্রসর হবে না ফিরে গিয়ে রাণী আর মাসুমাকে ডেকে আনবে। বাড়িটার ভেতরে নিশ্চয়ই কোন বিস্ময়কর ঘটনার সূত্র রয়েছে। জলপ্রপাতটি ঐ বাড়িটির ভেতর হতে বেরিয়ে আসছে।

বনহুর ভাবছে এমন সময় কেউ তার পিঠে কিছু ঠেকালো।

চমকে ফিরে তাকাতেই দু'চোখ তার স্থির হয়ে গেলো। ভীমকায় জমকালো চেহারা একটি লোক তার পেছনে অদ্ভুত এক যন্ত্র হাতে। জমকালো লোকটির চেহারা এবং পোশাকে যেন মিশে গেছে। কালো পোশাক পরা, তবে বস্ত্র নয়, চামড়ার তৈরি পোশাক। হাতে অচেনা একটি অস্ত্র। সেই অস্ত্রটি বনহুরের পিঠে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুরকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটা কিছু বললো।

বনহুর তার একবর্ণও বুঝতে পারলো না। তার দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়েছে।

লোকটা তার বলিষ্ঠ হাতে বনহুরকে চেপে ধরলো, তারপর সে জোরপূর্বক টেনে নিয়ে চললো সেই বাড়িটার দিকে।

বনহুর তাকে কোনো বাধা দিলো না। সে নীরবে লোকটির সঙ্গে এগিয়ে চললো। তার মনে একটা অজ্ঞাত জানার বাসনা, না জানি ঐ বাড়িটির মধ্যে কে আছে অথবা কি আছে।

লোকটির দেহে ভীষণ শক্তি।

বনহুরকে সে একটি বালকের মত টেনে নিয়ে এগুলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িটির সন্নিকটে পৌঁছে গেলো বনহুর ও সেই ভীষণ চেহারার লোকটি।

বাড়ির সম্মুখে একটি পাথরের মূর্তি।

জমকালো পাথরে তৈরি মূর্তিটি।

মূর্তির চোখ দুটো যেন জ্বলছে। যেন মূর্তিটি জীবন্ত। ভয়ংকর চেহারার লোকটি বনহুরকে মূর্তিটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিছু বললো–তারপর আবার তাকে টেনে নিয়ে চললো বাড়িটির মধ্যে।

বনহুর যত দুঃসাহসী হোকনা কেন তবুও তার মনে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। না জানি আবার সে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। ওদিকে রাণী

আর মাসুমা যে তারই অপেক্ষায় আছে। এখানে গভীর জালে সে যে এভাবে আটকা পড়বে তা ভাবেনি।

বনহুরকে এনে একটা বৃহৎ কক্ষে আটকে রাখলে লোকটা। দরজা বাইরে হতে বন্ধ করে দিলো।

লোকটা তাকে বন্দী করে চলে গেলো।

অবাক হলো বনহুর, এখান হতে বের হবার কোনো উপায় আছে কিনা দেখতে লাগলো। কক্ষটার একটি দরজা ছাড়া আর কোনো দরজা-জানালা নেই। কক্ষে জমাট অন্ধকার।

বনহুর দেয়াল হাতড়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

দেয়ালে কোন ছিদ্রপথ আছে কিনা দেখছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বনহুর অনেক হাতড়ে দেখলো, কোথাও কোন ছিদ্রপথ বা ঐ ধরনের ফাঁক নেই। বনহুর ফিরে এলো দরজার পাশে। দরজা ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলো, কিন্তু বড় শক্ত আর কঠিন সেই লৌহদরজা। বনহুরের শক্তিশালী বাহু একটুও টলাতে পারলো না দরজাটা।

বনহুর বসে পড়লো দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

সে কম আশ্চর্য হয়নি, এমন মজবুত দরজাসহ বৃহদাকার কক্ষ, এমন সুদৃশ্য অট্টালিকা গহন জঙ্গলে কে বা কারা তৈরি করেছে। এটা কোন্ দেশের সীমানা, কি নাম এ দেশের কিছুই জানে না বনহুর। লোকটাও বিস্ময়কর, যেমন অদ্ভুত চেহারা তেমনি তার কণ্ঠস্বর। তার একটি কথাও বনহুর বুঝতে পারেনি। কথার শব্দগুলো আশ্চর্য, উল্কট।

এলোমেলো অনেক চিন্তা বনহুরের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। হঠাৎ সেই সময় দরজা খুলে গেলো।

কক্ষের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো ছড়িয়ে পড়লো কক্ষে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো পূর্বের সেই লোক। হাতে তার সেই মেসিন বা যন্ত্রটি। যার দ্বারা সে বনহুরকে বাগে এনে অতি সহজে এখানে আনতে সক্ষম হয়েছে।

লোকটার দক্ষিণ হাতে একটি জ্বলন্ত মশাল।

মশালের আলোতে লোকটির দেহের জমকালো পোশাক চক চক করে উঠলো। বনহুর আরও অবাক হলো তার সঙ্গে অপর একটি লোক তার চেহারাও পূর্বের লোকটির মত।

বনহুরকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে কিছু বললো প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিও বনহুরকে অবাক হয়ে দেখছিলো।

এবার সে জবাব দিলো প্রথম ব্যক্তির কথার। বনহুর ওদের কথা বুঝতে পারছে না তবু আন্দাজ করলো ওরা তাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে।

বনহুরের অনুমান সত্য।

প্রথম ব্যক্তি বনহুকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো। তারপর শক্ত সাঁড়াশির মত হাত দিয়ে ধরলো একটি বাহু। টেনে নিয়ে চললো ঘরের বাইরে।

ঘর থেকে বের হবার মুহূর্তে লোকটা হাতের মশালটা ফেলে দিলো বাইরে দরজার একপাশে।

বনহুর একবার তাকালো জ্বলন্ত মশালটার দিকে। ইচ্ছা করলে বনহুর মশালটা সহজেই তুলে নিয়ে ওদের আক্রমণ করতে পারে এবং যত শক্তিশালীই ওরা হোক কাবু করতে বেশি সময় লাগবে না তার। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে চুপ রইলো সে। দেখতে চায় সে ব্যাপারখানা কি ঘটে।

ওরা বনহুরকে নিয়ে অগ্রসর হলো।

জলপ্রপাতের শব্দটা এখন আরও স্পষ্ট কানে ভেসে আসছে।

লোক দু'জন তাকেসহ অপর একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করলো। সেই কক্ষের দরজায় ঐ ধরনের একটি মূর্তি দন্ডায়মান। সবচেয়ে বিস্ময়কর মূর্তির চোখ দুটো। মনে হচ্ছে চোখ দুটি কোন জীবন্ত জীবের চোখ।

বনহুরকে নিয়ে ওরা সেই বৃহদাকার কক্ষে প্রবেশ করলো।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হলো বনহুর, একটি নারী বসে আছে, তার দু'পাশে দুটি মূর্তি কিছু পূর্বে যেমন দুটি মূর্তি বনহুর লক্ষ করেছে তেমনি। চোখ দুটিও যেন জীবন্ত।

লোক দু'জন বনহুরকে নিয়ে সেই নারীর সামনে হাজির করলো এবং অদ্ভুত ভাষায় কিছু বললো।

বনহুর অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে নারীটির মুখের দিকে। স্বাভাবিক নয় সেই মুখ, যেন জীবন্ত রাক্ষসী। চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত। চোখ গোলাকার এবং বড়। শরীরে চামড়ার পোশাক। বনহুর শিউরে উঠলো দাঁতগুলো লক্ষ করে। নারীর কঠিন দাঁতগুলো বড় এবং ধারালো। ঠোঁটের উপর বেরিয়ে আছে, যেন একটা দানবী।

ওরা বনহুরকে সামনে দাঁড় করিয়ে কিছু বললো।

সেই রাক্ষসী মূর্তি নারীটির চোখ দুটো খুশিতে চক চক করছে।

সে আসন ত্যাগ করে অদ্ভুত কণ্ঠে কি যেন বললো।

বনহুর অনুমানে বুঝতে পারলে, তাকে রাণীর পছন্দ হয়েছে। নারীটি যে ওদের রাণী বা দলনেত্রী তা অনুধাবন করলো বনহুর। লোকগুলো বনহুরকে টেনে নিয়ে এলো সে কক্ষের একপাশে।

এতক্ষণ বনহুর লক্ষ করেনি ঐ কক্ষটির একপাশে মেঝেতে একটি নরবলি দেবার মঞ্চ এবং পাশের দেয়ালে ঝুলন্ত অবস্থায় একটি ধারালো অস্ত্র। অস্ত্রটি খর্গ জাতীয়।

বনহুর বুঝতে পারলে তাকে বলি দেওয়া হবে। একটি পাত্র, পাত্রে রক্তের দাগ রয়েছে। ফিরে তাকালো বনহুর সেই নারী মূর্তিটির দিকে।

লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সঙ্গীটি তার দিকে।

বনহুরকে ওরা দু'জন পিছমোড়া করে বাধলো। একজন তার বুকের কাছে অদ্ভুত ধরনের, একটা অস্ত্র ধরে রেখেছে, যেন সে তাদের কাজে বাধা দিতে না পারে।

সত্যি কি তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। গহন জঙ্গলে এমন সুন্দর মনোরম অট্টালিকা, কে তৈরি করেছিলো তাই বা কে জানে। নিশ্চয়ই এরা নয়, কোনো সভ্য মানুষ এ অট্টালিকা তৈরি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু তারা কারা। নিশ্চয়ই এদের কাজ নয়, এরা শুধু অসভ্য জংলীই নয়, নরখাদক বটে। তাকে হত্যা করে তার রক্ত-মাংস খাবে এরা। ওদের রাণী পান করবে তার তাজা রক্ত। রাণীর কক্ষেই বলিদানের সরঞ্জাম, রক্তমাখা পাত্র।

অনেক কিছু ভাবছে বনহুর।

কিন্তু তার ভাবনা জাল ছিন্ন হয়ে গেলো।

বনহুরকে পিছমোড়া করে উবু করলো। একজন উঁচু করে ধরেছে খর্গ।

এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হবে ভাবতে পারেনি বনহুর। বন্দী অবস্থায় বেশ সময় কেটে গেছে। রাণী আর মাসুমা হয়তো বা তার সন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। তার সন্ধান কি আর কোন দিন পাবে ওরা।

বনহুর এমন বিপদে বহুবার পড়েছে, উদ্ধারও পেয়েছে।

কিন্তু এবার তার জীবন এভাবে বিসর্জন দিতে হবে ভাবতে পারেনি। এ মুহূর্তে তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খর্গধারী লোকটার চোখেমুখে হিংস্রতার ছাপ ফুটে উঠেছে। পাশে দন্ডায়মান লোকটা রক্ত গ্রহণের জন্য রাখা পাত্রটা দু হাতে ধরে রেখেছে শক্ত করে।

মাত্র এক মুহূর্ত, বনহুরের দ্বিখন্ডিত রক্ত মাখা অবস্থায় ভুতলে লুটিয়ে পড়বে। বনহুরকে কাঠগড়ায় উরু করে খর্গটা উঁচু করে ধরতেই একটি সুতীক্ষ ধার ছোরা এসে খর্গধারীর পিঠে বিদ্ধ হলো সমূলে।

একটা তীব্র আতনাদ করে ভূলুণ্ঠিত হলো খর্গধারী।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো কক্ষের দরজায় দন্ডায়মান দস্যুরাণী, তার হাতে। আরও একটি ছোরা।

সেই দন্ডে অপর লোকটা বনহুরকে ধরে ফেললো।

কিন্তু বনহুর পা দিয়ে ভীষণ জোরে আঘাত করলো লোকটি তলপেটে। লোকটা তলপেট দু'হাতে চেপে ধরে উবু হয়ে পড়ে গেলো, তারপর অসার হয়ে গেলো ওর দেহটা। বনহুরের বলিষ্ঠ পদাঘাতে তার তলপেটের নাড়ী বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তাই সে মৃত্যুবরণ করলো।

কক্ষে আর কেউ ছিলো না, সেই ভয়ংকর নারীটি ছাড়া।

তার অনুচরদ্বয়ের এ অবস্থা দর্শন করে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। আসন ত্যাগ করে দ্রুত নেমে এলো নিচে এবং দস্যুরাণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দস্যুরাণীর চেয়ে ভয়ংকরীর শরীরে ছিলো অনেক বেশি শক্তি। সে আক্রমণ করতেই দস্যুরাণী পড়ে গেলো মাটিতে। শুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি। দস্যুরাণী সুযোগ পাচ্ছিলো না, ছোরাখানা সে বসিয়ে দেবে অদ্ভুত নারীটির শরীরে।

বনহুরের হাত দু'খানা শক্ত করে বাধা ছিলো পেছনে, তাই সে আক্রমণ করতে পারছিলো না। তবুও সে পা দিয়ে ভয়ংকর নারীটির শরীরে আঘাত করলো। আশ্চর্য নারীটির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। দস্যুরাণীকে সে ভীষণভাবে চেপে ধরলো।

নিচে পড়ে গেল রাণী।

গলাটা চেপে ধরলো দু'হাতে ভয়ংকরী, সেকি অসীম শক্তি তার দেহে।

রাণীর হাতে সুতীক্ষ্ণধার একটি ছোরা থাকা সত্ত্বেও সে পারছিলোনা ছোরাটি ওর দেহে বিদ্ধ করতে।

বনহুর পা দিয়ে আঘাত করলো আবার।

এবার ভয়ংকরী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাণী ছোরাখানা আমূল বসিয়ে দিলো যেই বিস্ময়কর নারীটির পাঁজরে।

ছোরাবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত করে ফেললো মুখখানা ভয়ংকরী। তারপর ছোরাসহ সে উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আগুন

ঝরছে দু'চোখে! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে সে। পা দু'খানা টলছে মাতালের মত। দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে পাজরে বিদ্ধ ছোরাখানা টেনে তুলে ফেলার চেষ্টা করছে।

ততক্ষণে রাণী উঠে দাঁড়িয়েছে।

বনহুরের হাতের বাঁধন খুলে দিলো রাণী তাড়াতাড়ি।

ভয়ংকরী ছোরাবিদ্ধ অবস্থায় এবার ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

রাণী বললো–বনহুর আমি ভেবেছিলাম এমনি কোন একটি বিপদ এসেছে, তার জন্য ফিরে যেতে পারোনি।

হ্যাঁ রাণী, ভাবতে পারিনি এই অজানা জঙ্গলে গহবরে এমন একটি অট্টালিকা আছে আর সেই অট্টালিকার অভ্যন্তরে ছিলো এমন একটি রহস্যময় পরিস্থিতি। ঠিক সময়মত হাজির হতে পেরেছিলো বলে এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে....কথা শেষ না করে হাসলো বনহুর, তারপর বললো–রাণী অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।

দস্যুরাণী বললো–এখানে আর বিলম্ব করা আমাদের জন্য সমীচীন হবে না। কারণ এদের দলবল এসে পড়তে পারে। ইস্ ভয়ংকর এরা। মানুষ নয়, অসুর।

বনহুর আর রাণী তাকালো প্রাণহীন ভয়ংকর নারীটির দিকে তারপর অপর দুটি অসাড় রক্তাক্ত দেহের দিকে। কি ভয়ংকর অসভ্য জংলী তিনজন।

বললো বনহুর–আর আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

রাণী বললো–হা বনহুর, আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে আরও জংলী ভয়ংকর লোক থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বনহুর দ্রুতহস্তে ভয়ংকরী নারীটির পাঁজর থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে রাণীর হাতে দিলো, তারপর অপর লোকটির দেহ থেকে ছোরাটি তুলে নিয়ে বললো–চলো বাইরে চলে এখানে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। নতুন কোনো বিপদ ওত পেতে আছে কিনা কে জানে।

রাণী আর বনহুর বেরিয়ে এলো কক্ষ হতে।

বনহুর বললো–মাসুমা কোথায়?

তাকে আমি হেলিকপ্টারে ফিরে যেতে বলেছি, কারণ তোমার বিলম্ব দেখে আমি যখন তোমার সন্ধানে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন মনে করলাম তাকে সঙ্গে নেওয়া উচিত হবে না। কেমন অবস্থা বিরাজ করছে জঙ্গলের মধ্যে কে জানে।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই করেছে রাণী। মাসুমা তোমার সঙ্গে এলে এখানে এত সহজে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হতো না। তবে সে ঠিকমত হেলিকপ্টারে পৌঁছতে পেরেছে কিনা।

রাণী বললো–এছাড়া উপায় ছিলো না। বনহুর শব্দটা জল প্রপাতের কিন্তু কোথা থেকে এত পানি আসছে?

বনহুর বললো–হা আমার মনেও এ প্রশ্ন জাগছে। চলো রাণী দেখা যাক। তুমি এ ক্ষুদে ছোরা পেলে কোথা হতে রাণী?

মৃদু হেসে বললো রাণী-এগুলো আমার জামার আস্তিনের মধ্যে লুকানো খাপে রক্ষিত থাকে।

এতো ঝড়ঝাপটার মধ্যেও ওগুলো তোমাকে ত্যাগ করেনি তাহলে।

হা ওরা আমার ভীষণ ভক্ত। শুধু আজ নয় বনহুর, ওরা আমার জীবনের প্রধান সহচর।

কথার ফাঁকে সামনে এগুচ্ছিলো বনহুর আর রাণী।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় বনহুর, আংগুল দিয়ে ওদিকে দেখালো।

রাণীও তাকালো, বিস্ময়ে হতবাক হলো। একটি বৃহৎ সর্পমূর্তি এবং তার মুখ গহবর হতে জলপ্রপাত বেরিয়ে আসছে।

বনহুর আর রাণী দ্রুত এগিয়ে গেলো সেই বৃহদাকার সর্প-মূর্তিটির দিকে। স্বচ্ছ পানি সর্পমূর্তির মুখ থেকে বের হচ্ছে এবং তা গড়িয়ে পড়ছে নিচে একটি খাদের মধ্যে।

বনহুর আর রাণী উভয়ে ভাল করে লক্ষ করতেই আরও অবাক হলো সর্পমূর্তির ওপাশেই বিরাট আকার একটি খাদ।

সর্পমূর্তির উদর হতে যে জলরাশি নির্গত হচ্ছে তা গিয়ে সেই খাদে গড়িয়ে পড়ছে এবং কোথায় চলে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। নির্মল স্বচ্ছ জলধারা। বনহুর আর রাণী পিপাসায় অত্যন্ত কাতর ছিলো, তারা আরও নিকটে এগিয়ে গেলো। তাদের শরীরে জলধারার শীতল কণিকা ছড়িয়ে পড়ছে।

বেশ ভালো লাগছিলো বনহুর আর রাণীর।

বনহুর বললো–রাণী, এসো আমরা জলপ্রপাত থেকে পানি নিয়ে পান করি।

বনহুর আর রাণী দুজন জলপ্রপাত থেকে আঁজলাভরে পানি নিয়ে পান করলো। তারপর একটি সমতল জায়গায় ওরা পাশাপাশি বসলো।

বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা।

এ মুহূর্তে জলপ্রপাতের পানি তাদের নবজীবন দান করলো।

বনহুর বললো–মাসুমা একা আছে। চলো এবার আমরা ফিরে যাই। নতুন কোন বিপদ ওকে আবার বিপন্ন না করে।

রাণী বললো–ফিরে যাবার পূর্বে এই রহস্যপুরীর সব কিছু দেখতে চাই। সত্যি আমাকে এ বাড়িখানা বিস্মিত করেছে।

হ্যাঁ, আমাকেও তাই। বললো বনহুর!

রাণী নিপুণভাবে তাকাচ্ছিলো জলপ্রপাতের জলরাশির দিকে বললো–বনহুর, সর্পমূর্তিটি অদ্ভুতভাবে তৈরি করা হয়েছে। তার মুখগহ্বর থেকে যে জলরাশি নির্গত হচ্ছে তা আশ্চর্য বটে। ঠিক তাই, এই অজস্র জলধারা কোথা হতে আসছে। চারদিকে শুধু গভীর জঙ্গল আর শুষ্ক মাটি। মনে হয় কোনো ঝরণা ধারার গতিমুখ এই সর্পমূর্তির শরীরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করে ওর মুখগহ্বর থেকে নির্গত করা হয়েছে। কথাগুলো বললো বনহুর।

বনহুর আর রাণী উভয়ে মিলে প্রাণ ভরে পানি পান করলো সেই সর্পমুখ গহ্বর হতে নির্গত জল প্রবাহ থেকে।

বললো রাণী–চলো বনহুর আমরা সবকিছু দেখতে চাই। এই অট্টালিকার অভ্যন্তরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে।

চলো। সত্যি এই শীতল পানি পান করে বেশ সুস্থ বোধ করছি। তুমিও কি সুস্থ মনে করছো?

হ্যাঁ, বড় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম বনহুর।

ওরা সেই বিস্ময়কর বাড়িটির ভেতরে প্রবেশ করলো। যতই এগুচ্ছে ততই আশ্চর্য হচ্ছে। সুন্দর কারুকার্যখচিত অট্টালিকার দেয়ালগুলো।

বনহুর বললো–কোনো সুদক্ষ কারীগর এ সব তৈরি করেছে। সত্যিই বিস্ময়কর।

একটির পর আর একটি কক্ষ। হঠাৎ রাণী বলে উঠলো–দেখো, দেখো বনহুর এখানে একটি ছিদ্রপথ। নিশ্চয়ই ভূগর্ভে কোনো সুরঙ্গপথ আছে.....

হ্যাঁ রাণী, তুমি যে অনুমান করেছে তা সত্যি। বনহুর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো।

রাণীও দেখছে ছিদ্রপথে চোখ রেখে।

পাশে একটি পাথরখন্ড কিছুটা আলগা মনে হলো। বনহুর সমস্ত দেহের শক্তি দিয়ে পাথরটি সরিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। নিচে একটি সুরঙ্গপথ।

বনহুর বললো–রাণী এই রাজপুরীর গুপ্তরহস্য আত্মগোপন করে আছে এরই ভেতরে। আমি এর মধ্যে প্রবেশ করবো, তুমি উপরে অপেক্ষা করো, কারণ এক সঙ্গে ভূগর্ভে রহস্যময় গহবরে নামা ঠিক হবেনা।

কিন্তু নিচে নামাটা কি ঠিক হবে বনহুর?

বনহুর সেই অদ্ভুত সুরঙ্গ ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো, বললো–দেখতে চাই এর মধ্যে কি আছে।

কথাটা বলে সুরঙ্গ মধ্যে নেমে গেলো বনহুর।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নেই, হঠাৎ একটা আর্তনাদের শব্দ ভেসে এলো রাণীর কানে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে রাণীও সেই সুরঙ্গে নেমে গেলো।

একটি সুন্দর সুরঙ্গপথ নিচের দিকে নেমে গেছে।

আবছা আলোকরশ্মি আলোকিত করেছে নিচের দিকটা।

রাণীর হাতে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করে চলেছে চারদিকে। কিন্তু বনহুরকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে সে গেলো কোথায়? সামনে একটি প্রশস্ত কক্ষ, কক্ষটির মধ্যে আবছা অন্ধকার। রাণীর চোখে ধরা পড়লো দেয়ালে এবং ছাদে নানা ধরনের কারুকার্য। তবে মাকড়সার জালে কক্ষটির সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে গেছে। রাণী এগুচ্ছে, হঠাৎ হোঁচট খেলল। পায়ের দিকে তাকাতেই রাণী শিউরে উঠলো। ভালভাবে লক্ষ করে অবাক হলো, মেঝেতে একরাশ নরকংকাল স্তূপ করে রাখা হয়েছে। রাণী কিছুটা পিছিয়ে আবার এগুতে লাগলো। কিন্তু বনহুর কোথায়? তাকে তত দেখা যাচ্ছে না। রাণী উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলোবনহুর, তুমি কোথায়। বনহুর তুমি কোথায়। বনহুর.......

শুধু রাণীর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে। বনহুরের কণ্ঠের শব্দ শোনা গেলো না। তবে কি বনহুর কোনো ভীষণ বিপদে পড়েছে। অসম্ভব কিছু নয়, যে নরকংকালের স্তূপ রাণীর চোখে ধরা পড়েছে তাতে এই সুরঙ্গে ভয়ংকর কিছুর সম্ভাবনা রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃসাহসিকা রাণীর চোখে মুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠলো। সে সতর্কতার সঙ্গে এগুতে লাগলো।

কিছুটা এগুতেই আবার সেই আর্তকণ্ঠস্বর। বনহুরের কণ্ঠ তাতে কোনো ভুল নেই।

যে দিক থেকে শব্দটা ভেসে এলো সেদিকে রাণী দৌড়ে চললো। মাঝে মাঝে দেয়াল আর মাকড়সার জাল পথ রোধ করছিলো। পরপর দুখানা প্রশস্ত কক্ষ,

ভূগর্তে এমন বৃহৎ কক্ষ, আশ্চর্য বটে। তবে রাণী বেশি অবাক হলো গভীর জঙ্গলে ভূগর্তে এমন একটি বিস্ময়কর বাড়ি দেখে। কিন্তু এ বাড়ি নিয়ে ভাববার সময় এখন নয়। তার কানে বনহুরের কণ্ঠের ধ্বনির রেশ লেগে আছে। চারদিকে বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি রেখে এগুচ্ছে রাণী। সামনে একটি টানা সুরঙ্গপথ। রাণীর দৃষ্টি পড়তেই আর্তচিৎকার করে উঠলো-বনহুর। সে বললো, বনহুর আর একটি অদ্ভুত জীব ধস্তাধস্তি হচ্ছে। জীবটার চারপাশে হস্তী শুড়ের মত কয়েকটি পা। মাঝামাঝি দুটি চোখ-এবং একটি মুখ। মুখটা অদ্ভুত ধরনের।

জীবটা বনহুরের দেহ এমন শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে যে, বনহুর একচুল নড়তে পারছে না। গলাটাও একখানা বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। ভীষণভাবে চেপে ধরায় বনহুরের কণ্ঠনালী দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। দু'হাতে গলা থেকে বাহুটিকে সরানোর চেষ্টা করছে বনহুর।

রাণী থমকে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এখন কি করা তার কর্তব্য। অল্পক্ষণেই বনহুর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন যেমন ভাবে তোক জীবটাকে কাহিল করার চেষ্টা করতে হবে।

রাণী মুহূর্ত বিলম্ব না করে এগিয়ে গেলো এবং হাতের সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা সমূলে বসিয়ে দিলো সেই বিস্ময়কর জীবটির একটা বাহুতে। সংগে সংগে জীবটার অপর একটি বাহু রাণীকে জড়িয়ে ধরলো আচম্বিতে। নরম একটি হস্তিশুড় যেন বেষ্টন করে ফেললো তাকে। আর্তচীৎকার করে উঠলো রাণী।

ভয়ংকর মাকড়সার মত জীবটা তার বাহু দিয়ে বনহুরের মত শক্তিশালী পুরুষ আর রাণীর মত দুঃসাহসিকা নারীকে কাহিল করে ফেললো। বনহুর চেষ্টা করছে নিজের গলদেশ থেকে বাহুটা শিথিল করার জন্য। তার হাতেও একটি ছুরি ছিলো! বনহুর প্রথম আক্রমণেই ছোরাখানা ব্যবহার করেছিলো, প্রাণপণে নিজকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়েছিলো। ছোরা দিয়ে জীবটার বাহুতে কয়েকটি ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। তাজা লাল রক্তের ধারা ছুটছিলো জীবটার হস্তীশুড় আকৃতি বাহু দিয়ে! ভীষণ ধস্তাধস্তি, বনহুর আর রাণী দু'জনই আবদ্ধ হয়েছে। মরিয়া হয়ে পড়ছে ওরা। বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টনী হঠাৎ কিছুটা শিথিল মনে হলো, তাকালো সে সামনে। সে কোনোক্রমে ছোরাটিকে তুলে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। ওদিকে অপর একটি বাহুতে আবদ্ধ রাণীর মুখ দিয়ে গোঙ্গানির মত শব্দ বের হচ্ছে।

বনহুর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দক্ষিণ হাতখানা মুক্ত করে নিয়ে সম্মুখস্থ ছোরাখানা তুলে নিলো একটানে এবং মুহর্ত বিলম্ব না করে ছোরাখানা বসিয়ে দিলো জীবটার একটি চোখে।

সঙ্গে সঙ্গে জীবটার বাহুগুলো খুলে এলো এবং যন্ত্রণায় অদ্ভুত ভাবে নিজ বাহু দিয়ে অপর বাহুগুলো জড়িয়ে ধরতে লাগলো।

রীতিমত হাঁপাচ্ছিলো রাণী।

বনহুরের অবস্থাও তাই। ভয়ংকর জীবটার কবলে পড়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছে। ওরা। এভাবে রক্ষা পাবে ভাবতেও পারেনি। আল্লাহ পাকের রহমতে তারা রক্ষা পেলো, তাই হাজার শুকরিয়া করলো বনহুর আর রাণী।

জীবটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বনহুর আর রাণী এ দৃশ্য বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে লাগলো। কি সাংঘাতিক জীব, এমন ধরনের জীব তারা কোনো দিন দেখেনি। কতকটা অক্টোপাশের অথবা মাকড়সার মত দেখতে। এত বৃহৎ যে দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

বনহুর বললো–চলোলা রাণী আর এখানে নয়। ভালয় ভালয় ফিরে যেতে পারলে তবুও জীবন রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শেষবারের মত একবার জীবটার করুন অবস্থা লক্ষ করে দেখলো বনহুর আর রাণী। তারপর ওরা দ্রুত সুরঙ্গমুখটির দিকে ঢুকতে লাগলো। একমুহূর্ত এখানে বিলম্ব করা সমীচীন, নয়।

কোনোদিকে খেয়াল নেই, জীবন রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটছে বনহুর আর রাণী। একটা বিষাক্ত গ্যাস তাদের দম বন্ধ করে দিচ্ছে। আচমকা হোঁচট খেলো ওরা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো সেই নরকংকালের স্তূপের উপর। অমনি বনহুর রাণীর হাত ধরে টেনে তুলে নিলো আবছা আলোতে, নরকংকালগুলো ভয়ংকর মনে হচ্ছিলো।

রাণী বললো–এত নরকংকাল এখানে এলো কি করে ভেবে পাচ্ছি না।

বনহুর বললো–রাণী, সেই বিস্ময়কর রাক্ষসীর উদরে এদের রক্তমাংস রক্ষিত হয়েছে আর কংকালগুলো এখানে স্থান লাভ করেছে। একদিন এই বিস্ময়কর

বাড়িতে কোন সভ্য লোকজন বসবাস করতো।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। এই অট্টালিকা স্বাভাবিক নয়, গভীর জঙ্গলে এমন কেউ বা কারা বসবাস করতে লোকচক্ষুর অন্তরালে ......

রাণীর কথা শেষ হয় না, হঠাৎ নরকংকালগুলোর মধ্য হতে বেরিয়ে আসে ভীষণ একটা অজগর। মাথাটা বের করে দিতেই কংকালগুলো ছড়িয়ে পড়লো এপাশ ওপাশে। সেকি ভয়ংকর তার চোখ দুটো, যেন অগ্নিগোলক।

বনহুর আর রাণী উলকাবেগে ছুটতে লাগলো সুরঙ্গ মুখের দিকে। উপরে উঠবার সময় রাণী উঠতে পারছিলো না, বনহুর বললো–আমার হাতের উপরে পা রেখে উপরে উঠে যাও রাণী, তারপর তুমি আমার হাত ধরে সাহায্য করবে।

রাণী দ্বিধা করছিলো, বনহুর বললো–এখন কিছু ভাববার সময় নেই। তুমি আমার হাতের উপরে পা রাখো রাণী।

বনহুর তার হাত দু'খানা মেলে ধরলো।

রাণী বনহুরের হাতে পা রেখে উঠে পড়লো, তারপর হাত দুখানা নামিয়ে দিলো-এসো বনহুর, আমার হাত ধরে উঠে এসো......

বনহুর রাণীর হাত ধরে উঠে পড়লো।

মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো ওরা।

বনহুর বললো–এখানে আর বিলম্ব করা উচিৎ হবে না রাণী। এ বাড়িটির অভ্যন্তরে আরও কত রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে। চলো আমরা ফিরে যাই আমাদের সেই হেলিকপ্টারটির পাশে। জানিনা মাসুমা হেলিকপ্টারটার পাশে পৌঁছতে পেরেছিলো কিনা।

সুরঙ্গ পথটির মুখে দাঁড়িয়ে আবার ওরা তাকালো সুরঙ্গ মধ্যে। ওরা ভেতরে রয়েছে অগণিত নরকংকাল। কত মানুষ হত্যা করা হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। হয়তো এ বাড়ির মধ্যে বাস করতো মস্ত এক পরিবার। যাদের রক্তমাংস খেয়ে রাক্ষসী নারীটি এই প্রাসাদের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে বসেছিলো।

কি ভাবছো রাণী। বললো বনহুর।

রাণী বললো–ভাবছি একদিন এই অট্টালিকার মধ্যে কলকণ্ঠের আওয়াজে হয়তো মুখর হয়ে থাকতো আর আজ.....

রাণী, এ অট্টালিকা নিয়ে যত ভাববে ততই গভীর রহস্যে নিজকে হারিয়ে ফেলবে। একটু থেমে বললো–বনহুর সেই অদ্ভুত জীবটার কথা ভাবো একবার। যার বাহুগুলো অটোপাশের মত ভয়ংকর।

হা বনহুর, সত্যি আমার কাছে বড় আশ্চর্য লেগেছে জীবটা। অক্টোপাশ নয় বা বৃহৎ মাকড়সা নয়-কি ওটা? জীবটা সাংঘাতিক আর ভীষণ শক্তিশালী।

তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করলাম। উঃ! কি সাংঘাতিক জীবটা। ভাগ্যিস ছোরা দুটি তোমার সঙ্গী হিসেবে ছিলো তাই জীবনে রক্ষা পেলাম নইলে এ যাত্রা ঐ বিস্ময়কর জীবটার উদরে স্থান লাভ করতো। বনহুর আর রাণী বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হলো।

বনহুর বললো–রাণী ফিরে যাবার পূর্বে ঐ কক্ষে আর একবার প্রবেশ করতে চাই যে কক্ষে সেই রাক্ষসী রমণী আমার রক্ত পান করতে চেয়েছিলো.....

আবার সেই কক্ষে যাবে বনহুর।

চলো।

বনহুর আর রাণী সেই কক্ষের দিকে এগুলো। প্রশস্ত উঠান পেরিয়ে সেই কক্ষের দরজায় একটি জমকালো পাথরমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত। বনহুর সেই মূর্তিটির পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো–এই মূর্তিটি আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছে। নিশ্চয়ই এই মূর্তির মধ্যে কোনো গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে।

ও সব নিয়ে ভাবার সময় এখন নয় বনহুর। চলো আমরা ফিরে যাই সেই হেলিকপ্টারটিতে। মাসুমার কি অবস্থা হলো জানি না।

হ্যাঁ আমার মনেও এ ব্যাপারে দারুণ সন্দেহ জাগছে। মাসুমা কেমন আছে। সে ঠিকমত হেলিকপ্টারটিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলো কিনা।

বনহুর হঠাৎ মূর্তিটার বুকের কাছে একটি গোলাকার চাকতির মত বস্তু লক্ষ করলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর সেই অদ্ভুত চাকতিটির উপর চাপ দিতেই মূর্তির পদতলে একটি সুরঙ্গ মুখ বেরিয়ে পড়লো।

রাণী বললো–আশ্চর্য এখানে এমন সুরঙ্গ পথ আছে ভাবতে পারিনি।

বললো বনহুর–এসো রাণী, আমরা আবার নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে।

চলো তাহলে দেখা যাক। তবে আবার নতুন কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়বে কিনা কে জানে।

দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে। কথাটা বলে বনহুর হাতের ছোরাখানা মুঠায় চেপে ধরে অগ্রসর হলো।

রাণীও তার পেছনে প্রবেশ করলো।

সে এক নতুন জগত।

ভূগর্ভে সুন্দর একটি বৃহৎ কক্ষ। কক্ষটির অভ্যন্তরে নানা ধরনের কাঁচের জার বা পাত্র। নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। বনহুরের দু’চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে। মাটির তলায় একটি গবেষণাগার। তবে বেশ পুরোন, বহুদিন ঐ গবেষণাগারে হস্তক্ষেপ হয়নি। কাঁচের পাত্রগুলোতে ঝুল আর ধুলো-ময়লাতে বুঝবার জো নেই, সেগুলো কিসের তৈরি। বনহুর হাত দিয়ে ধূলো ময়লা সরিয়ে অনুধাবন করলো সেই পাত্রগুলো কাঁচ দিয়ে তৈরি। নানা ধরনের পাত্র, এবং নানা রকম ওষুধ আর যন্ত্রপাতি রয়েছে। বনহুর ও রাণী সুরঙ্গমুখের স্বল্প আলোকরশ্মিতে সব স্পষ্ট দেখছিলো। তারা আরও দেখলো দেয়ালে একটি বিরাট আকার জীবের ছবি। বনহুর আর রাণী দৃষ্টি বিনিময় করলো, বললো রাণী-বনহুর এই ছবিটা কেমন জীবন্ত মনে হচ্ছে এবং সেই জীবটার সঙ্গে এর হুবহু মিল আছে।

বনহুর বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে বলে মনে হলো রাণীর কাছে। বললো রাণী-আবার কি ভাবছো? এ ছবিটা সেই জীবটার প্রতিচ্ছবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ রাণী, একেবারে সত্য। এ চিত্রটি কোন ফটো নয়। হাতের আঁকা ছবি, তবুও কত জীবন্ত। এবং যে জীবের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জীব দ্বারাই আমরা আক্রান্ত হয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার ভীষণ বিস্ময় জাগছে, এই গবেষণাগারে ঐ ভয়ংকর জীবটির ছবি এলো কি করে এবং কে এই চিত্র এঁকেছে-আর কেনই বা এঁকেছে

ঐ দেখো বনহুর, ঐ চিত্রটির অপর ধারে আরও কয়েকটি চিত্র কিন্তু ওগুলো আকারে অনেক ছোট ঠিক পূর্বের জীবটার মতই কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি। মনে হচ্ছে জীবটি প্রথমে ক্ষুদ্র মাকড়সার আকার ছিলো, পরে তা এই বৃহদাকারে পরিবর্তন হয়।

আরও এগুলো বনহুর আর রাণী। সব বিস্ময়কর, মস্ত বড় টেবিল। টেবিলে নানা ধরনের জার সাজানো। জারগুলোর মধ্যে কোনো তরল পদার্থ ছিলো। তার মধ্যে মাকড়সার মত কতগুলো জীব। ধূলোমাটিতে কাঁচের জারগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বনহুর আর রাণী হাত দিয়ে ধূলো সরিয়ে ফেলতেই আরও অবাক হলো, পরিস্কার ইংরেজিতে লেখা-মাংথু অস্কর থেকে মাংথু থুই হবে। বনহুর ভাল করে তাকালো মস্ত বড় জীবটার ছবিটার নিচে। সেখানেও স্পষ্ট লেখা রয়েছে-মাংথু থুই-এ পরিণত হয়েছে।

বনহুর বললো–কোনো বৈজ্ঞানিক এখানে ভূগর্ভে কোনো মাকড়সা ধরনের জীব নিয়ে গবেষণা করে তাকে এই বিস্ময়কর জীবে পরিণত করেছে আর সে কারণেই তার এ অজ্ঞাতবাস ছিলো।

বললো রাণী–হ্যাঁ বনহুর, তোমার অনুমান সত্য। যে জীবটা আমাদের দুজনকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছিলো সেই জীবটারই ছবি ওটা।

রাণী, আমরা আরও কিছু গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবে বলে আমরা ধারণা। ঐ দেখো জারগুলোর মধ্যে ছোটবড় মাকড়সা ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির জীবের কংকাল।

হঠাৎ রাণী বলে উঠলো–ওধারে একটা টেবিলে কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটি কংকাল চেয়ারে কাৎ হয়ে পড়ে আছে।

ঠিক বলেছো রাণী, এসো দেখা যাক। বনহুর আর রাণী ঐ টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলো। টেবিলে বিরাট একটি জার বা কাঁচপাত্র। কিন্তু কাঁচপাত্রটি সম্পূর্ণ ভাঙা। সারা টেবিলে ছড়িয়ে আছে কাঁচপাত্রের বড় বড় টুকরাগুলো। টেবিলের পাশের চেয়ারে একটি কংকাল কাৎ হয়ে পড়ে আছে। কংকালটি বহুকালের, তাই ছাই-এর মত ধূসর রং হয়ে পড়েছে। বনহুর বললো–রাণী, এই সেই বৈজ্ঞানিক যিনি মাকড়সা থেকে অটোপাশ বানিয়েছেন-এ কংকালটি তারই।

রাণী গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছিলো।

বনহুর পুনরায় কংকালটিকে লক্ষ্য করে বললো—এর মত্যও ঘটেছে তারই সৃষ্ট জীবটির দ্বারা! দেখছো রাণী টেবিলটা কেমন কাৎ হয়ে আছে, কাঁচের জারটি ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। অন্যান্য জিনিসপত্র এলোমেলো। জীবটা বৈজ্ঞানিক বা সেই আবিষ্কারককে হত্যা করেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শুধু বৈজ্ঞানিককেই হত্যা করেনি, যারা এই গবেষণাগারে ছিলো সবাইকে হত্যা করেছে এবং তাদের রক্ত শুষে নিয়েছে। উঃ! কি ভীষণ আর ভয়ংকর জীবটা। নিশ্চয়ই এই সুরঙ্গ দিয়েই সেই জীবটার কাছাকাছি যাওয়া যায়। আমরা আবার সেই জীবটার কাছাকাছি পৌঁছতে পারি।

দরকার নেই বনহুর। এ বাড়ির গভীর রহস্য উদঘাটন হয়েছে, আর আমি এখানে বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। চলো ফেরা যাক। কথাগুলো বললো রাণী।

বনহুর রাণীর কথা সমর্থন করলো যদিও সে গভীর জঙ্গলে এই বিস্ময়কর বাড়িটি দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলো। তারপর এ বাড়ির নিকটস্থ হতেই কে বা কারা তাকে আটক করেছিলো এবং তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিলো। রাণী তাকে সেই ভয়ংকর মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। নইলে তার মৃত্যু ছিলো অনিবার্য।

কিন্তু কারা তারা! সেই ভয়ংকরী নারীটি, যার রক্তপিপাসা নিবারণে তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিলো। শুধু নারীটিই নয় তার সঙ্গীরা কারা? বনহুর আর রাণী তাদের যতটুকু পরিচয় পেয়েছে তাতে বেশ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে নারী ও তার সঙ্গীরা শুধু অসভ্য জংলীই নয়, তারা জঙ্গলের রাক্ষসী, রাক্ষসও ছিলো বটে। বনহুর ও রাণী ওদের হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে এটা তাদের পরম আনন্দের কথা। একটা আত্মতৃপ্তি বনহুর আর রাণীর মনকে প্রছন্ন

করেছে। তবে গভীর রহস্য জাগছিলো বনহুর ও রাণীর মনে। অট্টালিকা যদিও বহু পুরানো তবুও তেমনভাবে বিনষ্ট হয়নি আজও। কোনো কারিগর সুকৌশলে সুন্দরভাবে গভীর অরণ্যে অত্যন্ত যত্ন সহকারে এ বাড়ি বা অট্টালিকাটি নির্মাণ করেছিলো, যা আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

এ বাড়ির আসল মালিক যে ঐ অসভ্য জংলী নরখাদকগণ নয় তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বনহুর ও রাণী ভালভাবেই তা বুঝতে পারে। তাদের অনুমান সত্যে পরিণত হয় যখন বনহুর আর রাণী বাড়িটার অভ্যন্তরে ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গপথে প্রবেশ করে। এমন দক্ষমিস্ত্রী দ্বারা নিচের সুরঙ্গপথ ও ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছিলো যা শুধু আশ্চর্যই নয়, বিস্ময়করও বটে। একটি সুরঙ্গমুখ নয় দুটি সুরঙ্গমুখ রয়েছে। নিচে আলো প্রবেশের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও মাটি আর বালিতে সবকিছু ঢাকা পড়ে গেছে তবুও বেশ বোঝা যায় এখানে যে বা যারা বাস করতো তারা অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান কিন্তু কালের পরিবর্তনে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে।

বনহুর যাকে নিয়ে ভাবছিলো, সে একজন বিজ্ঞ গবেষক-নাম ছিলো তার বৈজ্ঞানিক আর ডু। তাঁর গবেষণা ছিলো জীবজন্তু নিয়ে। একটি জীবকে কি কি অন্য জীবে পরিণত করা যায় সেটাই ছিলো বৈজ্ঞানিক আর ডুর গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। সুদীর্ঘ সময় ধরে তিনি মিশনিয়ার এক দুর্গম স্থানে বসে একটির পর একটি জীব নিয়ে গবেষণা চালিয়ে ছিলেন। বিড়ালকে বাঘে পরিণত করা যায় কিনা এ ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ বিশ বছর গবেষণা চালিয়ে ছিলেন। তাতে মিশনিয়ার বিড়ালের বংশ একেবারে নির্বংশ হয়ে পড়েছিলো। শহরে গ্রামে গঞ্জে এটা নিয়ে ভীষণ হৈ চৈ পড়ে যায়। নানা জনের নানা কথা রটে মিশনিয়ায়। ধনকুবের গবেষক আর ডু বিব্রত বোধ করেন। তার অর্থ তিনি যা খুশি করুন এ ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাক তা তিনি চাইতেন না। বৈজ্ঞানিক আর ডু চিরকুমার ছিলেন। সংসারের কোনো ঝামেলা তার ছিলো না। প্রচুর অর্থ আর সম্পদ তাকে উদার করেছিলো। মন তার অনেক বড় ছিলো, অর্থ খরচ করতে ডু কোনো সময় কার্পণ্য করেননি। তার গবেষণাগার কোনো এক গোপন স্থানে হলেও তা গোপন রইলো না। মিশনিয়ার অনেকেই বৈজ্ঞানিক আর ডুর সেই দুর্গম গোপন গবেষণাগারে গিয়ে হাজির হতো। তারা আর ডুর বিস্ময়কর গবেষণা নিজ চোখে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছুটে যেতো। ক্রমে দর্শকগণের ভীড় আর ডুকে ভীষণ ক্ষিপ্ত করে তুললো। তার গবেষণায় নানা অসুবিধা দেখা দিলো, তাই একদিন সকলের

অজ্ঞাতে নিজ বাড়ি এবং গবেষণাগারের মায়া ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হলেন আর ডু।

তার নিজস্ব জাহাজ মার্কটর নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি জমালেন। মিশনিয়ার জনগণ একদিন গিয়ে দেখলো আর ডুর গবেষণাগার শূন্য পড়ে রয়েছে। কাঁচপাত্র এবং নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিছুই নেই সেখানে। একটি গোপন কক্ষে তারা আবিষ্কার করলো লক্ষ লক্ষ বিড়ালের কংকাল।

তারপর আর কোনো দিন বৈজ্ঞানিক আর ডুকে মিশনিয়ার কেউ দেখতে পায়নি।

আর ডু তার নিজস্ব জাহাজ নিয়ে সন্ধান করে ফিরতে লাগলেন কোথায় তার গবেষণা চালিয়ে সফলতা লাভ করতে পারবেন। তার মূল উদ্দেশ্য কোনো অজানা-অচেনা জনহীন স্থানে তিনি তার গবেষণা চালিয়ে যাবেন।

জাহাজে তেমন কোনো সঙ্গী তার ছিলো না। মাত্র তিন জন নাবিক নিয়ে আর সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তার জাহাজে ছিলো বৈজ্ঞানিক মেসিনাদি ও সরঞ্জাম। তার সঙ্গী তিনজন শুধু জাহাজ চালনায় পারদর্শীই ছিলো না, তারা সুদক্ষ মিস্ত্রী বা কারিগরও ছিলো। আর ডুর অসময়ের বন্ধু ছিলো ওরা তিনজন। ওদের সহযোগিতায় আর ডু অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন।

অজানা স্থানে, জনমানবহীন গহন জঙ্গলের অভ্যন্তরে আর ডু গড়ে তুললো তার অজ্ঞাত গবেষণাগার। বিভিন্ন দেশ থেকে কারিগর এনে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তৈরি হলো বিস্ময়কর এক অট্টালিকা। শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকটি ভয়ংকর চেহারার পাথরের মূর্তিও আর ডু বিদেশ থেকে এনে অট্টালিকার বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছিলেন। জীবজন্তুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভূগর্ভ থেকে জলস্রোত প্রবাহিত করেছিলেন। তা ছাড়াও পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন কোনো সময় পানির অভাব না হয়।

গম্ভীর অরণ্যে বিরাট অট্টালিকা এবং ভূগর্ভে তার গবেষণাগার তৈরি করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিলো। তার সঙ্গে পরিশ্রম ছিলো অপরিসীম।

বৈজ্ঞানিক আর ডু গভীর অরণ্যে গবেষণা চালালেন বটে কিন্তু এবার তিনি বিড়াল হতে বাঘ নয়, মাকড়সা থেকে অক্টোপাশ জাতীয় জীব বানাবেন-এই

সাধনা চললো।

দীর্ঘ সময় পর তার সাধনা সফল হলো।

একদিন তার কাঁচপাত্রের ভেতরে রক্ষিত মাকড়সা বিরাট আকারে পরিণত হলো। এবং কাঁচপাত্র ফেটে বেরিয়ে পড়লে তার হস্তীড় পাগুলো নিয়ে ঐ মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক আর ডু আর পালাতে পারলেন না। তারই সৃষ্টি মাকড়সা তার বৃহদাকার পাগুলো দিয়ে আর ডুকে জড়িয়ে ধরলো এবং গুড় দিয়ে তার কণ্ঠনালীর রক্ত চুষে নিলো।

বৈজ্ঞানিক আর ডু ভাবতেও পারেননি সেদিন যে তারই সাধনার ফল এমন মর্মান্তিক হবে। হস্তীশুড়বিশিষ্ট জীবটি আর ডুর রক্ত পান করে ভূগর্ভে আস্তানা গেড়ে নিলো। আর ডুর তিন জন সঙ্গীকেও সে ঐভাবে হত্যা করে তাদের রক্ত পান করলো।

তারপর ক্ষুধার্ত জীবটা সেই ভূগর্ভ গবেষণাগারটির মধ্যে সবকিছু তচনচু করে ফেললো। এমন দিনে একদল অসভ্য নরখাদক সেই জঙ্গলে প্রবেশ করলো। সমস্ত জঙ্গল তারা চষে ফিরতে লাগলো। যে জীবজন্তু তারা পেতো ধরে হত্যা করে করে খেতে।

এ দলটি কোনো পর্বতের গুহায় বসবাস করতো এবং মাঝে মাঝে সমুদ্রতীরে অথবা বন জঙ্গলে নেমে আসতো। সন্ধান করতে খাদ্যের। কাঁচা মাংস আর রক্ত ছিলো তাদের প্রিয় খাদ্য। তারা যে কোনো জীবজন্তু দেখতো তাদের কৌশলে ধরে ফেলতে এবং হত্যা করে খেতো।

এই নরখাদকদের কবল থেকে উদ্ধার পেতো না কোনো হিংস্র জীবজন্তুও। একবার বৈজ্ঞানিক আর ডুর নির্জন বনভূমির মধ্যস্থ অট্টালিকাটি নজরে পড়ে তাদের। অসভ্য জংলীদের দলনেত্রী বিশাল শক্তিশালিনী রাক্ষসীর নজরে এ বাড়িটি বড় পছন্দ হয়। তখন সে তার দলবল নিয়ে পর্বতগুহা থেকে বেরিয়ে চলে আসে এ অট্টালিকায় এবং আসন গেড়ে নেয় ওরা এখানে।

মানুষ হলেও ওরা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলো না। অট্টালিকাটি ভাল লাগলো, তাই তারা সেখানে বসবাস শুরু করলো। এমন গভীর জঙ্গলে এত সুন্দর অট্টালিকা কারা তৈরি করেছে আর কেনই বা করেছে এ খোঁজ নেয়ার মত জ্ঞান-

বুদ্ধি তাদের ছিলো না। তাই তারা মহা আনন্দে সেই অট্টালিকায় আসন গাড়লল। জঙ্গলে যে কোনো জীব দেখলে তারা ধরে আনতে এবং হত্যা করে মাংস খেতো আর রক্ত পান করতো।

মাঝে মাঝে জঙ্গল ছেড়ে তারা সমুদ্রধারে যেতো। যদি কোনো জাহাজ ভুল করে তীরের নিকটবর্তী হতো এবং যাত্রিগণ তীরে অবতরণ করতো তখন ওরা শিকারী বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলতো, তারপর নিয়ে আসতো বৈজ্ঞানিক আর ডুর সেই অট্টালিকায়। দলনেত্রীর আদেশক্রমে হত্যা করা হতো। মহা হই-হুঁল্লোড়ের মধ্যে চলতো তাদের রক্ত পান ও মাংস খাওয়া। ওরা আগুন জ্বালতে জানতো না, কাঁচা মাংসই খেতো। এ কারণে ওদের শক্তি ছিলো অসুরের মত। হিংস্র বাঘ, সিংহ, ভালুক এমন কি গন্ডারকেও ওরা কাহিল করে ফেলতো। গাছের লতা দিয়ে রশি বানাতে এবং সেই রশি দিয়ে তারা বন্য জীবজন্তু পাকড়াও করত, তারপর পাথরের আঘাতে হত্যা করতো।

এমনি করে অসভ্য জংলীরা দখল করে নিলো বৈজ্ঞানিক আর ডুর পোড়োবাড়িখানা। ওরা সংখ্যায় অনেক ছিলো। দলনেত্রী শুধু অট্টালিকার মেঝেতে শয়ন করতে আর দলবল সবাই বাড়িটার মধ্যে এখানে সেখানে বিশ্রাম করতো।

বৈজ্ঞানিক আর ডুর মাকড়সা থেকে সৃষ্ট জীবটির কিন্তু এখনও মৃত্যু ঘটেনি। সুদীর্ঘ সময় ধরে সে ভূগর্ভে অবস্থান করে চলেছে। রাতের অন্ধকারে জীবটা সুরঙ্গপথে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং খাদ্যের সন্ধানে সবার অলক্ষ্যে বিচরণ করে বেড়ায়। দলনেত্রী যখন অট্টালিকার মেঝেতে অঘোরে ঘুমাতো তখন তার সঙ্গীসাথীরা পোড়াবাড়িটার উঠানে বা এখানে সেখানে ঘুমাতো। ঐ সময় আর ডুর জীবটি তাদের একটির পর একটি ধরে নিয়ে যেতে আর তাকে হত্যা করে শুড় দিয়ে রক্ত চুষে নিতে। জীবটি তার শিকারগুলোকে একই স্থানে হত্যা করতে এবং ভূগর্ভে একদিন তাই নরকংকালের স্তূপ জমে উঠেছে।

দিনের পর দিন এমনি করে রাক্ষসী দলনেত্রীর সঙ্গীসংখ্যা কমে যেতে লাগলো কিন্তু দলনেত্রী তা টের পাচ্ছিলো না। সে শক্তিশালিনী ছিলো, তবে বুদ্ধিমত্তা তার ও তার সঙ্গীদের মোটেই ছিলো না। দলনেত্রী বা তার সঙ্গীদের যদি বুদ্ধি থাকতো তা হলে তারা এই অট্টালিকার ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গপথ আবিষ্কার করতে পারতো এবং অনেক রহস্য তারা উদঘাটন করতে সক্ষম হতো। ওরা অসভ্য জংলী, তাই তারা

শুধু জীব-জানোয়ারের মত হিংস্র স্বাভাবিক মানুষের মত তাদের জ্ঞান ছিলো না, বিবেক-বুদ্ধি ছিলো না।

এক সময় বনহুর ও রাণী বৈজ্ঞানিক আর ভুর ভূগর্ভ গবেষণা থেকে বেরিয়ে এলো। এতক্ষণ তাদের ভূগর্ভ গবেষণাগারের বদ্ধ আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। তারা পুনরায় মুক্ত আঙ্গিনায় সূর্যের আলো-হাওয়ায় ফিরে এসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো। যদিও ক্ষুধায় তাদের বেশ কষ্ট হচ্ছিলো তবুও তারা ঝরনা ধারার স্বচ্ছ পানি পান করে শান্তি লাভ করলো।

ওরা আগে জানতে পারেনি এমন অবস্থার শিকার তারা হবে। বনহুরকে কৌশলে রাণী বশীভূত করেছিলো, তার কাজ সে করিয়ে নেবে বলে। রাণী জানতো, একমাত্র বনহুর ছাড়া আর কেউ তার এ কাজে সহায়তা করতে পারবে না। কারণ অসীম সাহসীই শুধু বনহুর নয়, অসীম শক্তিশালীও বটে। মাঝে মাঝে দস্যুরাণীর মনে জাগতে বনহুরের প্রতি শ্রদ্ধা। স্বামী আহাদ চৌধুরীর কাছে ব্যক্ত করেছে রাণী একথা। বনহুর আর আহাদ চৌধুরীর মধ্যে অনেকটা মিল দস্যুরাণী খুঁজে পেতো, তাই ওকে ভালো লাগতো তার।

মাথুন দ্বীপের সেই স্বর্ণগুহায় প্রবেশ করে এমন সাধ্য কারও হবে না, সেই স্বর্ণগুহায় প্রবেশ করে বনহুর ফিরে এসেছে। রাণীর কাছে এ কথা অজ্ঞাত ছিলো না, আর সে কারণেই রাণী নিজে যা সমাধা করতে পারতো না তখন সে শরণাপন্ন হতে বনহুরের এবং তাকে যেমন করে হোক ছলে-বলে-কৌশলে নিজ আয়ত্তে আনতে। এবার রাণীর উদ্দেশ্য ছিলো মাথুনের স্বর্ণগুহা থেকে প্রচুর স্বর্ণ উদ্ধার করে ফিরে আসবে এবং সেই স্বর্ণ হাতে এলে ইচ্ছামতো পৃথিবীর নগণ্য অবহেলিত মানুষ যারা তাদের মুখে হাসি ফোঁটাতে পারবে। আর সেই ইচ্ছাটি পূর্ণ করা সম্ভব হতো বনহুরের দ্বারা। সে যদি সহায়তা করে তাহলে মাথুনের স্বর্ণগুহা তারা নিজেদের হাতের মুঠায় পেতে পারে।

রাণীসহ বনহুর পোড়োবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

তারপর তারা দ্রুত পদক্ষেপে ফিরে চললো জঙ্গল ছেড়ে তাদের সেই হেলিকপ্টারটির দিকে। যেখানে অপেক্ষা করছে অসহায় মাসুমা রিজভী। সমস্ত দিন ধরে হেঁটে এক সময় বনহুর ও রাণী বন থেকে বেরিয়ে এলো। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও জমাট বেধে উঠেনি। দ্রুত পা চালিয়ে এলেও মাঝে মাঝে তারা পথ ভুল করে বনের মধ্যে একই স্থানে এসে পৌঁছছিলো।

অনেক ঘুরেফিরে তবেই পথ চিনে তারা বনের বাইরে আসতে সক্ষম হলো। ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে তাই তারা সেই স্থানে এসে গেলো, যে স্থানে বসে তারা বিশ্রাম নিয়েছিলো বনে প্রবেশ করবার পূর্বে।

বনহুর আর রাণী লক্ষ করলো তাদের হেলিকপ্টারখানার দিকে।

চমকে উঠলো বনহুর আর রাণী।

হেলিকপ্টারটির পাশে বেশ কিছু লোককে দেখা গেলো।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর–রাণী, দেখো আমাদের সেই হেলিকপ্টারটির পাশে

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু লোক সেখানে এসেছে। তবে কি কোনো দল এখানে এসে পড়েছে?

তা অনুমান করা কঠিন। এরা ও শত্রুপক্ষের লোকজনও হতে পারে, যাদের কবল থেকে আমরা মাসুমাকে উদ্ধার করেছিলাম

বনহুর, তোমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে ভয়ংকর একটি অবস্থার জন্য প্রস্তুত হও।

জানি না ওরা কারা, তবে নিকটে পৌঁছানোর পর সব অনুধাবন করা সম্ভব হবে। চলো দ্রুত পা চালিয়ে চলো, দেখি মাসুমার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ কানে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার।

রাণী ব্যস্তকণ্ঠে বললো–বনহুর, মাসুমা বিপদে পড়েছে। ওরা নিশ্চয়ই সৎ ব্যক্তি নয়।

তাই মনে হচ্ছে। কথাটা বলেই বনহুর ছুটতে লাগলো।

রাণীও ছুটলো তার পিছু পিছু।

বনহুর এবং রাণীর অনুমান সত্য। একটি জলদস্যু দল তাদের ছিপনৌকা নিয়ে সমুদ্রতীরে অবতরণ করেছিলো। তারা সমুদ্র বক্ষ হতে দেখতে পেরেছিলো

হেলিকপ্টারটিকে এবং পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তারও তাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়েছিলো।

জলদস্যু দলটির দলপতি ছিলো একটি মারাঠা তরুণ।

সে মাসুমাকে দেখতে পেয়ে ছিপনৌকাখানা তীরে নেবার জন্য তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়েছিলো। তীরে পৌঁছানোর পর তারা সবাই মিলে হেলিকপ্টারটির নিকটে পৌঁছে এবং হেলিকপ্টার ও মাসুমাকে দেখে অবাক হয়। কারণ জনহীন বালুকাময় প্রান্তরে হেলিকপ্টার এবং একটি তরুণী এলো কি করে। তারা অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলো হেলিকপ্টারটি অকেজো তবে একেবারে বিনষ্ট নয়। মাসুমাকে তারা দেখে বিমুঢ় হলো। মারাঠা জলদস্যুর দলপতির লোলুপ দৃষ্টি গিয়ে পড়লো মাসুমার ওপর। বিলম্ব না করে তরুণ দলপতি মাসুমাকে টেনে নিয়ে চললো তাদের ছিপনৌকার দিকে।

সমুদ্রের গর্জন আর মাসুমার করুণ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হলো সমুদ্রতীরের নির্জনতায়।

ততক্ষণে বনহুর প্রায় পৌঁছে গেলো মাসুমা ও সেই দুষ্ট জলদস্যু দলপতিটির কাছাকাছি।

বনহুর পর পর কয়েকটি ঘুষি বসিয়ে দিলো যে লোকটি মাসুমাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো সমুদ্রের দিকে তার নাকেমুখে। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। মাসুমা ছুটে গিয়ে রাণীকে জাপটে ধরলো।

বনহুরের প্রচন্ড আক্রমণে হকচকিয়ে গেলো ওরা।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে মাসুমা রিজভী।

বনহুরকে ওরা সবাই মিলে আক্রমণ করলো।

কিন্তু বনহুরের কাছে তারা কতক্ষণ টিকতে পারে। যদিও বনহুর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো তবুও তাকে কাহিল করা ওদের পক্ষে সম্ভব হলো না।

বনহুর ওদের সবাইকে নাজেহাল করে ছাড়লো।

দলপতি ছুটলো তাদের ছিপনৌকাখানার দিকে। তার সঙ্গীরাও ছুটলো। ওরা কোনো অস্ত্র নিয়ে তীরে অবতরণ করেনি, ভেবেছিলো ভগ্ন একটি হেলিকপ্টার ও একটি তরুণী:.....সেখানে অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন হবে ওরা মনে করেনি। এবার ওরা মার খেয়ে কুকুরের মত ছুটলো সমুদ্রের দিকে।

বনহুর আর ওদের পিছু ধাওয়া করলো না, তবে ঠিকই অনুমান করলো ওরা জলদস্যু। যারা মাসুমাকে তার পিতার কাছ থেকে ফুসলিয়ে এনেছিলো এরা তারা নয়। এরা মারাঠাজাতি বেশ বুঝে নিলো বনহুর।

রাণী আর বনহুর ঠিক সময়মত পৌঁছতে না পারলে মাসুমা রিজভীকে আর খুঁজে পেত না। মাসুমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে তাকায় মাসুমা বনহুর আর রাণীর মুখের দিকে।

এদিকে ঝাপসা অন্ধকার সমুদ্রতীরটাকে গভীর অন্ধকারে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

বনহুর বললো–ওরা আর আসবে না। রাণী তুমি মাসুমাকে নিয়ে হেলিকপ্টারের মধ্যে আশ্রয় নাও, আমি বাইরে থাকি।

তুমি প্রহরীর কাজ করবে আর আমরা...

এ ছাড়া আর কি করবার আছে বলো? বিশেষ করে বেচারী মাসুমাকে রক্ষা করাই আমাকে এখন সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

হা বনহুর বেচারী মাসুমা–বললো রাণী। তার কণ্ঠে একরাশ করুণা ঝরে পড়লো।

যদিও মাসুমার মুখমন্ডল অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না তবুও রাণী বুঝতে পারলো তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। অসহায়া লাঞ্ছিতা মাসুমা।

*

সমুদ্রের গর্জন আর ঠান্ডা হাওয়ায় বনহুরের কান দুটো বরফ বনে যাওয়ার যোগাড়। এখানে আগুন জ্বালার কোনো ব্যবস্থা নেই, নেই কোনো গরম কাপড়। বনহুর প্রতীক্ষা করছে। কখন ভোর হবে, সূর্য আলো ছাড়াবে। সূর্যের তাপে

শরীরটা গরম হয়ে উঠবে। বনহুর জড়োসড়ো হয়ে হেলিকপ্টারটির সঙ্গে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। এলোমেলো অনেক চিন্তাই তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে পড়ছে আস্তানার কথা, কতদিন সে আস্তানায় যেতে পারে নি। সঙ্গীদের খোঁজখবর নিতে পারে নি। যদিও রহমান এখন আস্তানায় রয়েছে তার অবর্তমানে সে-ই সব দেখাশোনা করছে। রহমান তার বিশিষ্ট সহচর, তার উপর বনহুরের অনেক বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে।

আস্তানা নিয়ে ভাবতে গিয়ে আরও অনেক কথা মনে পড়ছে নুরী, জাভেদ তার প্রত্যেকটা অনুচর সবাইকে স্মরণ হচ্ছে। মা মনিরা ওরা সবাই কেমন আছে কে জানে।

বৃদ্ধা মায়ের কথা স্মরণ হতে দু'চোখ তার অশ্রুসিক্ত হয়।

মাকে বনহুর কোনোদিন খুশি করতে পারলো না। মা তাকে সংসারী হওয়ার জন্য বহুবার বলেছিলেন কিন্তু সে পারেনি মায়ের কথা রাখতে। সবচেয়ে তার বড় দুঃখ এটা মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর জানে না।

সূর্যের আলো মুখে পড়তেই ঘুম ভেঙে যায় বনহুরের।

বনহুর চোখ মেলে লজ্জিত হয়, পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাণী।

হেসে বললো রাণী– কষ্ট হয়েছিলো না?

চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসলো। আজ বেশ স্বচ্ছ লাগছে তার মনটা। ভোরের দিকে বেশ ঘুম হয়েছে।

মাসুমাও বেরিয়ে এলো হেলিকপ্টারটির মধ্য হতে।

ক্ষুধা-পিপাসায় মাসুমার চোখ দুটো বসে গেছে। করুণ তার মুখমন্ডল। বনহুরের দৃষ্টি তার দিকে পড়তেই মাসুমা লজ্জায় মাথা নত করে নিলো।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

খাবারের সন্ধানে রাণী হেলিকপ্টারে প্রবেশ করে, কিছুক্ষণ পর আনন্দের উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে ওঠে-বনহুর, আমি একটা জিনিস পেয়ে গেছি। দেখবে

এসো, দেখবে এসো...

রাণীর আনন্দ বিগলিত কণ্ঠস্বরে বনহুর আশ্চর্য হলো।

মাসুমাও কিছুটা অবাক হলো, এমন কি পেয়েছে সে।

বনহুর হেলিকপ্টারটির মধ্যে প্রবেশ করে দেখলো পেছন আসনের নিচে বেশ কিছু জ্বালানি তেল রয়েছে।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠলো।

রাণী জ্বালানীর পাত্র নিয়ে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। বনহুর হাত বাড়িয়ে পাত্রটি গ্রহণ করলো। বললো বনহুর–রাণী, আমরা আবার ফিরে যেতে পারবো। আমাদের আসনের নিচে হেলিকপ্টারটির জন্য প্রচুর জ্বালানি মজুত ছিলো ভাবতেও পারিনি।

মাসুমার মুখেও আনন্দের আভাস ফুটে উঠলো। বনহুর হেলিকপ্টারটিতে জ্বালানি পূর্ণ করে নিয়ে পরীক্ষা চালালো, সেটা অকেজো হয়ে পড়েছে কিনা।

মোটেও অকেজো হয়নি।

হেলিকপ্টারটি বনহুর মাসুমা আর রাণীসহ আকাশে ভেসে উঠলো।

বনহুর দক্ষ পাইলটের মত হেলিকপ্টারটির চালকের আসনে বসেছে। আর রাণী তার পাশে, কোনো সহায়তা দরকার পড়লে যেন সে বনহুরকে সহযোগিতা করতে পারে।

বনহুর আর রাণী ভাবতে পারেনি তারা সেই জ্বালানীবিহীন হেলিকপ্টারটি আবার আকাশে ভাসাতে পারবে। হেলিকপ্টারটি অকেজো হয়ে পড়েনি এ জন্য তাদের আনন্দের সীমা রইলো না।

ওরা ভুলে গেলে ক্ষুধা-পিপাসার কথা।

আনন্দে উজ্জ্বল তাদের চোখ মুখ।

নীল আকাশে ভেসে চলেছে ওরা।

শুভ্র বলাকার মত হালকা মেঘগুলো তাদের হেলিকপ্টারটির দুপাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

রাণীর চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে সমুদ্রবক্ষ নিরীক্ষণ করছিলো। মাঝে মাঝে বনহুরের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো তার। তারা দক্ষিণ পূর্বকোণ ধরে অগ্রসর হচ্ছে।

মাসুমা রিজভীর চোখমুখ আশায় দ্বীপ্ত হয়ে উঠেছে। হয়তো তার জীবনে নতুন আলো ফিরে আসতে পারে। মনে পড়ে অনেক কথা, প্রচুর ঐশ্বর্য আর ধন-সম্পদের মধ্যে সে মানুষ হয়েছে। আব্বু বড় অমায়িক হৃদয়বান ব্যক্তি। তার ব্যবসা ভাল চলছিলো, এমন দিনে এলো নতুন এক পার্টনার। সভ্যজগতের ভন্ড মুখোসধারী এক নরপশু। মাসুমার বাবা মিঃ মসিয়ুর রিজভীকে সে হাত করে নেয় সুবুদ্ধি বলে। মাসুমা কিন্তু প্রথম দিনের সাক্ষাতেই বুঝতে পেরেছিলো, লোকটা অর্থশালী বটে কিন্তু এক ভয়ংকর জীব সে। তার প্রমাণ পেয়েছিলো মাসুমা কিছুদিনের মধ্যেই। বড় সরল মানুষ মসিয়ূর রিজভী বিশ্বাস করলেন নরপশুটাকে। তাকে পরিবারের একজন বানিয়ে নিয়েছিলেন। আসল নাম তার কেউ জানতো না, সবাই তাকে এ, কে বিশ্বাস বলে ডাকতো।

একদিন বিশ্বাস তাকে নতুন একটি মুক্তার মালা দিয়ে বলেছিলো-মাসুমা এটা পছন্দ হয়?

মাসুমা ভেবেছিলো তার বাবার বন্ধু তাই হয়তো কন্যার স্নেহে তাকে মুক্তার মালা উপহার দিচ্ছে তাই সে সেদিন হাত বাড়িয়ে মালাটা গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বিশ্বাস বলেছিলো, এসো মালাটা আমি পরিয়ে দেই.....

মাসুমা চমকে না উঠলেও আঁৎকে উঠেছিলো। কারণ মিঃ এ. কে বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরে ছিলো একটা লালসাপূর্ণ সুর। কক্ষে সেই মুহূর্তে কেউ ছিলো না, মাসুমা মুক্তার মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো তার হাতের উপর।

এরপর মাসুমা এ. কে বিশ্বাসকে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু তার সরল বাবা মা বুঝতেন না। তাঁরা মিঃ বিশ্বাসকে সরল মনে বিশ্বাস করতেন। মাসুমাকে সব সময় তার পাশে বসিয়ে কথা বার্তা বলতে উৎসাহিত করতেন। মাসুমা গান জানতো, প্রায়ই মিঃ বিশ্বাস এসে আব্দার জানাতো, মাসুমা আজ তোমাকে গাইতে হবে।

মাসুমা অসুখের ভান করে কেটে পড়ার চেষ্টা করতেই মা বলতেন, মাসুমা একটা গান শোনাও তোমার বিশ্বাস চাচাকে।

মায়ের কথা ফেলতে পারতো না মাসুমা, বাধ্য হয়ে হয়তো বা একটা গান শোনাতো। কিন্তু তার মন মিঃ বিশ্বাসের ওপর তিক্ততায় ভরে উঠতো। বিশ্বাস বিশ্বাস ঘাতকতা করলো তার সহচরদের মাধ্যমে।

মাসুমা যখন আপন মনে নানা চিন্তার জাল বুনে চলেছে, তখন রাণী দেখতে পায় একটি ভাসমান জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, জাহাজে কোনো যাত্রী বা লোজন দেখা যাচ্ছে না।

অবাক হয়ে বললো রাণী-বনহুর দেখছো একটি জাহাজ।

হ্যাঁ রাণী, তবে জাহাজখানা খুব মন্থর গতিতে এগুচ্ছে.....

আরও আশ্চর্য জাহাজে কোনো লোকজন নেই ....

তুমি তাও লক্ষ করেছে রাণী?

হ্যাঁ বনহুর। এত বড় জাহাজ অথচ কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না–ব্যাপার কি। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি জাহাজখানা চলছে যেন আপন মনে। সমুদ্রবক্ষ নীরব একটি জলযানও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

এ কথা সত্য। আমরা এখন সমুদ্রের মাঝামাঝি এসে পড়েছি। এটা কোন সমুদ্র, কি নাম তাও জানি না। শুধু থৈ থৈ পানি ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ছে না।

জানি না বনহুর আমরা তীরে পৌঁছতে পারবো কিনা।

যে জ্বালানি আমরা পেয়েছি তাতে কিছুটা ভরসা করা যায়। হয়তো সমুদ্রের ওপারে পৌঁছতে পারবো। তবে একটা আশংকা মনে জাগছে জাহাজখানা কি সত্যি জনমানবহীন অবস্থায় ভেসে চলেছে? আমি দেখতে চাই, কি বলো রাণী-তোমার মত আছে?

বনহুর, তোমার এ ইচ্ছাকে দমন করো, কারণ অসম্ভব ঐ জাহাজখানার উপরে অবতরণ করা। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে মাসুমা রয়েছে.....

রাণীর কথায় বনহুরের মুখে হাসি ফুটলো, বললো সে-তুমি অহেতুক ভাবছো রাণী। জাহাজখানা বেশ বড় তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং জাহাজের পেছন অংশে যে কোনো একটি যান অবতরণ করার মত প্রচুর জায়গা রয়েছে। মাসুমার জন্য তুমি তো রয়েছে......

তোমার সাহসকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি বনহুর, তবে কোনো বিপদ আসবে না তা আমি অস্বীকার করতে পারছি না।

হাসলো বনহুর।

মাসুমার মনটা দুলে উঠলো, কারণ সে তাদের কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছিলো। যদিও সে পেছন আসনে ছিলো। ওরা আবার নতুন একটা বিপদকে সানন্দে অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছে। কি ভয়ংকর দুঃসাহসী এরা। মাসুমার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। একটা ভীতিভাব জাগলো তার মনে। তবে কি ওরা সত্যি ঐ ভাসমান জাহাজখানার উপরে অবতরণ করবে?

মাসুমার কানে আবার বনহুরের গলার স্বর ভেসে এলো, রাণী, জাহাজখানাকে আমি অনুসরণ করছি। তুমি ভালভাবে বাইনোকুলারে লক্ষ করো নতুন কিছু আবিস্কার করতে পারো কিনা।

হ্যাঁ, আমি আমার চোখে বাইনোকুলার ধরে রেখেছি। একটা এত বড় জাহাজ আপন মনে ভেসে চলেছে, একটি প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ব্যাপারখানা রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর হেলিকপ্টারখানাকে সেই জাহাজটির উপরিভাগে নিয়ে এলো। তারপর কৌশলে নিচে নামিয়ে নিলো এবং ভালভাবে সব কিছু লক্ষ করতে লাগলো।

রাণী নিজেও অবাক হয়েছে, জাহাজখানা আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছে একটি জল জীবের মত।

বনহুর বললো–জাহাজখানা আমাকে বিস্মিত করেছে রাণী।

আমাকেও! বললো রাণী।

বনহুর বললো–আমি জাহাজখানার উপরে হেলিকপ্টারখানাকে নামাতে চাই। তুমি কি বলো রাণী?

আমারও সে রকম ইচ্ছা। তবে আবার কোনো নতুন বিপদে পড়বো কিনা সন্দেহ।

বনহুর হেসে বললো–বিপদ নিয়েই যখন আমরা খেলা করছি তাতে আর ভয় বা উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

হেলিকপ্টারখানা ধীরে ধীরে জাহাজখানার উপরে নামতে লাগলো।

রাণীর দু'চোখে বিস্ময় না জানি জাহাজখানার মধ্যে তারা কি দেখতে পাবে। হয়তো নতুন একটি কিছু বিরাজ করছে, হয়তো বা ভয়ংকর কিছু.....

ততক্ষণে জাহাজখানার উপরে নেমে পড়েছে বনহুরের হেলিকপ্টারখানা। বনহুর আর রাণী লক্ষ করলো মাসুমার চোখেমুখে একটা ভয় আর আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছে। এতক্ষণ সে নিশ্চপ ছিলো, এবার বললো–আপনারা জেনেশুনে কেন আবার নতুন একটা বিপদ মাথা পেতে নিলেন। জানি না আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

বনহুর মাসুমার পিঠ চাপড়ে বললো–বোন, কোন দুশ্চিন্তা করোনা। আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন।

মাসুমার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, লোকটা এমন দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ, আল্লাহর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ....

কিছু ভেবো না। বললো রাণী।

বনহুর মাসুমার পিঠ চাপড়ে তাকে অভয় দান করে এগিয়ে গেলো।

রাণী মাসুমার পাশে রইলো কারণ মাসুমাকে একা রেখে ওরা দু'জন সরে যেতে পারে না। নতুন কোনো বিপদ হানা দিতে পারে।

বনহুর এগিয়ে চললো।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই একটি শব্দ শুনতে পেলো, কোন লোকের চাপা কণ্ঠস্বর। কিছু বোঝা গেলো না, তবে মনে হলো যেন কোন সাউন্ড বকসের মধ্য হতে শব্দটা বেরিয়ে আসছে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তারপর আবার সে সিঁড়ি বেয়ে ছাদ থেকে নিচে ডেকের উপর নেমে এলো। ভালভাবে লক্ষ করতে লাগলো চারদিকে।

জাহাজখানা বেশ বড়।

একটি কেন দুটি হেলিকপ্টার পাশাপাশি অবতরণ করতে পারে। এতবড় জাহাজ অথচ একটি প্রাণী নেই, এ যেন গভীর জঙ্গলের সেই পোড়াবাড়িখানা। বনহুর সোজা ইঞ্জিন কেবিনের দিকে এগিয়ে চললো।

একটি লোহার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়।

জাহাজের সামনের ভাগের খোলর মধ্যে ইঞ্জিনকক্ষ। বনহুর দ্রুত নেমে গেলো ইঞ্জিন কক্ষে। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। সে দেখতে পেলো একটি লোক দাঁড়িয়ে হ্যান্ডেল চেপে ধরে আছে। সামনে দিকদর্শন যন্ত্রটার দিকে তার চোখ। ইঞ্জিনচালক বনহুরের পদশব্দে ফিরেও তাকালো না, সে গভীর মনোযোগ সহকারে জাহাজ চালনায় ব্যস্ত।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এতবড় জাহাজখানা, শুধুমাত্র একজন চালক ব্যাপার কি। বনহুর শব্দ করলো, কিন্তু নাবিক ফিরে তাকালো না। বনহুর বললো–হ্যালো....হ্যালো-.....

কিন্তু নীরব সে। শুধু হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে যাচ্ছে সে।

বনহুর এগুতেই একটি হাত তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়ালো। বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো একটি লোক তার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখমন্ডল কালো কাপড়ে ঢাকা।

হাতখানা বনহুর সরিয়ে ফেলবার জন্য হাতের ওপর হাত রাখতেই অবাক হলো, এটা মানুষের হাত নয়! একচুলও বনহুর সরাতে পারলো না। মনে হলো যেন লোহার তৈরি হাত।

বনহুর মুহূর্তে বুঝে নিলো লোকটা যান্ত্রিক এবং যে নাবিক জাহাজখানার হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে সেও যান্ত্রিক। তাই তার কণ্ঠস্বর শুনেও নাবিক ফিরে তাকায়নি। একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের মুখে! কারণ আরও একবার তাকে এ ধরনের অবস্থায় পড়তে হয়েছিলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ইঞ্জিন কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়ালো। কিন্তু সেই দন্ডে কেউ যেন ইঞ্জিনঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো বনহুর।

তাকালো সে সামনে দন্ডায়মান যান্ত্রিক লোকটার দিকে। ততক্ষণে লোকটার হাতখানা নেমে পড়েছে। সে ধীরে ধীরে পা বাড়ালো বনহুরের দিকে। বনহুর এবার পিছুতে শুরু করলো।

যান্ত্রিক লোকটা বনহুরের দিকে হাত বাড়িয়ে এগুতে লাগলো।

বনহুর পেছন ফিরে দেখলো তার পিঠ কেবিনের দেয়ালে এসে ঠেকবে। আর নড়বার জো থাকবে না। যান্ত্রিক লোকটা তার দুটি লোহার হাত দিয়ে চেপে ধরবে তার গলা। রক্ত মাংসের শরীর হলে বনহুর এতো ঘাবড়ে যেতে না কারণ তাকে পরাজিত করা নিশ্চয়ই তার জন্য সম্ভব ছিলো। কিন্তু যান্ত্রিক মানুষ, একটি লৌহ যন্ত্র তাকে কাহিল করা মুস্কিল হবে।

বনহুর দ্রুত সরে গেলো যান্ত্রিক মানুষটির লক্ষ্যস্থলের মধ্য হতে।

আশ্চর্য, যান্ত্রিক মানুষটি ফিরে দাঁড়ালো এবং পুনরায় তার দিকে এগুতে লাগলো।

ওপাশে বনহুর একটি লোহার চেয়ার দেখতে পেলো, চেয়ারখানা ক্ষিপ্রগতিতে তুলে নিলো হাতে, তারপর যান্ত্রিক লোকটার দুটো প্রসারিত হাতের উপর ছুঁড়ে মারলো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার একখানা হাত ঝুলে পড়লো।

তবুও এগুচ্ছে লোকটা।

মুখখানা কালো কাপড়ে ঢাকা থাকায় বনহুর যান্ত্রিক লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জাহাজের চালকের পাশে এসে দাঁড়ালো। একবার তাকিয়ে দেখে নিলো লোকটার মুখমন্ডল। যা সে অনুমান করেছিলো ঠিক তাই। একটি ভীষণ ভয়ংকর মুখ। বনহুর সরে এলো, চালক হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে!

ওদিকে যান্ত্রিক লোকটা বনহুরের দিকে এগুচ্ছে।

বনহুর ক্যাবিনের ওধারে একটা সাদা সুইচ দেখতে পেলো। ক্ষিপ্রগতিতে সাদা সুইচটার উপরে চাপ দিলো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনের দেয়ালে একটি দরজা বেরিয়ে পড়লো।

এবার বনহুর সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা পূর্বের ন্যায় বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর তাকাচ্ছে চারদিকে।

একটি গলিপথের মত জায়গাটা। বনহুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শব্দ হলো, ফিরে তাকাতেই অবাক হলো বনহুর। ক্যাবিনের বন্ধ দরজা ভেঙে সেই যান্ত্রিক লোকটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। একটি হাত এখনও ঝুলন্ত অবস্থায় পাশে দুলছে। অপর হাতখানা প্রসারিত রয়েছে।

বনহুর ছুটতে লাগলো।

যান্ত্রিক লোকটা যদি তাকে ধরে ফেলে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য কারণ যান্ত্রিক লোকটা তার সেই হাতখানা দিয়ে কণ্ঠ চেপে ধরবে। যেমন করে হোক যান্ত্রিক লোকটার কবল থেকে তাকে সরে যেতেই হবে। কিন্তু যাবে কোথায়। সামনে না জানি কি বিপদ ওত পেতে আছে। পেছনে যান্ত্রিক লোকটা, সামনে নতুন কোনো বিপদের সম্ভাবনা।

আবার একটি ক্যাবিন।

বনহুর সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

দেখলো কতগুলো বাক্স প্যাকিং করা রয়েছে। পাশে কয়েকখানা টেবিল। টেবিলে নানাধরনের মানচিত্র কাঁচের ফ্রেম দিয়ে আটকানো। বনহুর ভালভাবে এসব লক্ষ করার সময় পেলোনা, যান্ত্রিক লোকটা প্রায় তার কাছাকাছি এসে গেছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর একটি টেবিল ধরে ঠেলে দিলো লোকটার দিকে।

কিন্তু আশ্চর্য, টেবিলটার আঘাতে যান্ত্রিক লোকটার শরীর একটুও টললো না। সে টেবিল ডিংগিয়ে চলে এলো। বনহুর যেদিকে দ্রুত সরে যাচ্ছে সেদিকেই যান্ত্রিক লোকটা তার একখানা হাত প্রসারিত করে এগুচ্ছে।

এবার বনহুর শূন্য একটি ব্ল্যাক দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি র‍্যাকটা ধরে ঝুলে পড়লো।

যান্ত্রিক লোকটা ঠিক বনহুরের ঝুলন্ত পায়ের কাছে এসে থেমে গেলো। বনহুর পা দু'খানা দিয়ে প্রচন্ড লাথি মারলো যান্ত্রিক লোকটার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক নোকটার মুখ থেকে কালো কাপড়খানা সরে গেলো।

বনহুর দেখতে পেলো মানুষের মুখ নয়, সেখানে কিছু কলকজা ও সুইচ রয়েছে। দুটো বাল্ব জ্বলছে আর নিভছে। বনহুর পুনরায় পা দিয়ে আঘাত করতে যাবে সেই মুহূর্তে যান্ত্রিক লোকটা সরে গেলো সম্মুখ দিকে। এবার বনহুর লাফিয়ে নেমে পড়লো, তারপর যেদিক থেকে ঐ ক্যাবিনে প্রবেশ করেছিলো ঐ পথে বেরিয়ে ইঞ্জিন ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

এবার বনহুর সোজা ইঞ্জিন ক্যাবিন থেকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, কারণ তখন দরজা খোলা ছিলো। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই নজরে পড়লো তাদের হেলিকপ্টারখানার পাশে রাণী এবং মাসুমা নেই।

বনহুর চিন্তিত হলো কিন্তু বেশিক্ষণ ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে অপর একটি ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। সেই ক্যাবিনে শুধু পানীয় পাত্র। বনহুর একটু এগুতেই সশব্দে পড়ে গেলো জাহাজের খোলের মধ্যে। হুমড়ি খেয়ে পড়লেও তেমন কোনো আঘাত বনহুর পায়নি, উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে। একি, সেই যান্ত্রিক মানুষটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। মুখমন্ডল খোলা, আলোর বালব জ্বলছে আর নিভছে। যান্ত্রিক কলকবজাগুলো কেমন বিকৃত দেখাচ্ছে। এগিয়ে আসছে যান্ত্রিক লোকটা।

এবার তাকে ধরে ফেলবে এবং গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করবে। কাছাকাছি এসে পড়েছে যান্ত্রিক লোকটা।

বনহুর পিছু হটতে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেলো। তার হাত স্পর্শ করলো একটি সুইচে। বনহুর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সুইচটা টিপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনটির মেঝেটা দ্রুত নেমে চললো নিচের দিকে। যান্ত্রিক মানুষটা উবু হয়ে পড়ে গেলো।

মেঝেটা বনহুরকে নিয়ে নেমে যাচ্ছে।

যান্ত্রিক লোকটা কিন্তু আটকে পড়লো মেঝের অর্ধাংশে।

মেঝেটার কিছু অংশসহ বনহুর নেমে এলো নিচে। সম্মুখে তাকাতেই দেখলো চারপাশে লোহার জাল ঘেরা একটা বাক্স। আরও অবাক হলো সেই লোহার বাক্সটার মধ্যে হাত-পা বাধা দুটি নারী। বনহুরের বুঝতে বাকি রইল না তারা রাণী ও মাসুমা।

কিন্তু ওরা এখানে এলো কি করে? তবে কি যান্ত্রিক কোনো লোক ওদের বন্দী করেছে?

মুহূর্ত ভেবে নিলো বনহুর তারপর দ্রুত এগিয়ে গেলো বাসটির পাশে। রাণী আর মাসুমা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাসটার মধ্যে পড়ে আছে।

হঠাৎ একটা বিকট হাসির শব্দে ফিরে তাকালো বনহুর। সে দেখতে পেলো একটা লোক বসে আছে অদূরে একটি সুউচ্চ স্থানে। তার সম্মুখে একটা সুইচ বোর্ডের সঙ্গে কতগুলো সুইচ। লোকটা একটা সুইচ টিপলো।

বনহুরের পায়ের নিচে মেঝেটা দুলতে শুরু করলো।

অনেক চেষ্টা করছে বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াতে। যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে তবুও সে স্থির হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। লোকটা পুনরায় হেসে উঠলো, তারপর শুদ্ধ ইংরেজিতে বললো–তোমার দুঃসাহস আমাকে অবাক করেছে.....কে তুমি কি তোমার উদ্দেশ্য.....

বনহুরও ইংরেজিতে জবাব দিলো-আমরা দুঃসাহসী বটে। পরিচয় মানুষ-তবে লৌহমানুষ নই-আমাদের উদ্দেশ্য তোমাদের জাহাজখানা তল্লাশি করে দেখা……

আবার সেই অট্টহাসি।

কি ভয়ংকর কণ্ঠস্বর!

বনহুর বললো–তুমি যেই হও আমি তোমাকে বন্ধু বলে মেনে নিলাম। তুমি তোমার দোলায়মান মেঝেটাকে থামিয়ে ফেলে।

জবাব এলো-তোমার দুঃসাহসকে অভিনন্দন জানালেনও তোমাকে বন্ধু বলে মেনে নিতে পারি না। তোমার সঙ্গী দু'জনকে বন্দী করে লৌহখাঁচায় আবদ্ধ করেছি, তোমাকেও ওদের সঙ্গী করবো এবং একদিন তোমাদের কংকালগুলো সমুদ্রের জলোচ্ছাসে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

বনহুর হেসে বললো–সুন্দর তোমার বক্তব্য। আমি সানন্দে মেনে নিলাম। তবে সবচেয়ে। বড় দুঃখ তুমি আমাদের বন্ধু বলে মেনে নিতে পারছে না। যদি বন্ধু বলে গ্রহণ করতে তাহলে, আমরা তোমাকে বহুভাবে সাহায্য করতাম যা তুমি কারও কাছে পাওনি।

ধীরে ধীরে বনহুরের পায়ের নিচে দোদুল্যমান মেঝের অংশটা থেমে গেলো। বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়ালো এবার। একটা উৎকট শব্দ ভেসে আসছে তার কানে।

বনহুর তাকাতেই তার চোখে পড়লো একটি লোহার মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাতে একটি শিকল। লোকটা যান্ত্রিক হলেও তার চলার ভঙ্গী ঠিক একটি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের মত। এই যান্ত্রিক লোকটার মুখমন্ডলও কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত।

বুঝতে পারলো বনহুর যান্ত্রিক লোকটা তাকে বন্দী করতে এগিয়ে আসছে। পিছু হটতে লাগলো বনহুর।

উচ্চ আসনে বসা লোকটা সম্মুখস্থ একটি বোতাম টিপলো। যান্ত্রিক লোকটা দ্রুত এগুচ্ছে এবার বনহুরের দিকে। লোকটা একটির পর একটি বোতাম টিপছে, ডান এবং বাম দুহাতেই লোকটা কাজ করে চলেছে। এ লোকটাই যে গোটা জাহাজের পরিচালক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোকটার সামনে একটি

টেলিভিশন পর্দা রয়েছে। সুইচে লোকটার আংগুল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক লোকটা পা ফেলছে এবং কাজ করছে। অপর সুইচগুলোতে আংগুলের চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানার বিভিন্ন ক্যাবিনের ছবি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং লোকটি তার যান্ত্রিক লোক দ্বারা সুইচের মাধ্যমে তাদের পরিচালনা করছে।

আসনে উপবিষ্ট লোকটিকে কোনোক্রমে কাহিল করতে পারলে বনহুর জয়ী হতে পারবে এবং মাসুমা ও রাণীকে বদ্ধ খাঁচা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। তবে যান্ত্রিক লোকটার কবল থেকে এ মুহূর্তে নিজকে রক্ষা করতে হবে। নইলে সেও বন্দী হবে রাণী আর মাসুমার মত।

যান্ত্রিক লোকটা দ্রুত এগিয়ে আসতেই বনহুর অপর দিকে সরে দাঁড়ালো এবং ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গেলো উচ্চ আসনে বসা লোকটার দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুর লোকটার ওপর।

শুরু হলো প্রচন্ড ধস্তাধস্তি।

বনহুর লোকটাকে তার আসন থেকে টেনে নামিয়ে আনলো। লোকটা তার পাশের সুইচ বোর্ডের দিকে হাত বাড়ালো কিন্তু বনহুর দ্রুত তার হাতখানা টেনে সরিয়ে আনলো। হয়তো সুইচে হাত স্পর্শ করাতে পারলে সে আর একটা বিপদে ফেলতে পারে তাই বনহুর সতর্কভাবে কাজ করলো।

কয়েকটি ঘুষিতে লোকটা কাহিল হয়ে পড়লো।

বনহুর তুলে নিলো তাকে হাতের উপর এবং বের করে আনলো ক্যাবিনের বাইরে। বনহুর তাকিয়ে দেখলো যান্ত্রিক মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। ওদিকে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে রাণী আর মাসুমা রিজভীর সংজ্ঞাহীন দেহ। বনহুর ক্যাবিনের বাইরে এসে দাঁড়ালো, তার কাঁধে সেই লোকটা যে এতক্ষণ উচ্চ আসনে বসে বোতাম টিপছিলো। ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে আসতেই লোকটা কৌশলে বনহুরের কণ্ঠনালী জড়িয়ে ধরে ভীষণ জোরে চাপ দিলো। বনহুরের হাত দু'খানা একটু শিথিল হলো, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা লাফিয়ে পড়লো জাহাজের ডেকে।

বনহুর মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

প্রচন্ডভাবে আবার শুরু হলো লড়াই। বনহুরের মুষ্টিঘাতে জর্জরিত যান্ত্রিক লোকগুলোর পরিচালক দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে, মাথার

একপাশে ও বেশ খানিকটা অংশ কেটে গেছে। তবু সে বনহুরকে আক্রমণ করতে ছাড়লো না।

কিন্তু বনহুর তাকে সুযোগ দিলো না, সেও পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে নাজেহাল করে ফেললো। বনহুর মুহূর্ত অসতর্ক হলে লোকটা তাকে নতুন বিপদে ফেলতে পারে তাই সে সজাগ ভাবে কাজ করছিলো। কারণ এমন ধরনের বিপদের সঙ্গে তাকে সব সময় মোকাবেলা করতে হচ্ছে, কাজেই এ ব্যাপারে বনহুর ভীষণ সতর্ক।

লোকটা যখন হাত বাড়াচ্ছিলো সম্মুখস্থ একটি সুইচ বোর্ডের দিকে তখনই বনহুর তাকে কৌশলে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে এবং তাকে আঘাতের পর আঘাতে কাহিল করে ফেলে। বনহুর এবার লোকটাকে প্রচন্ড এক ধাক্কায় ডেকের দিকে ঠেলে দিলো। লোকটা টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে গেলো সাগরগর্ভে।

বনহুর হাতের পিঠে মাথার ঘাম মুছে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর ডেকের পাশে এসে ঝুঁকে পড়লো। যেখানে লোকটা ছিটকে পড়ে ছিলো সেখানে তাকালো। শুধু ফেনিল জলরাশি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না।

হাঁফ ছেড়ে বনহুর ফিরে দাঁড়ালো।

জাহাজখানা তখন মন্থর গতিতে চলছে।

বনহুর আর বিলম্ব না করে পূর্বের সেই ক্যাবিনে ফিরে এলো। যে ক্যাবিটার মধ্যে রাণী আর মাসুমা রিজভীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখনও সেই লৌহখাঁচার মধ্যে রাণী ও মাসুমা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে দেখতে পেলো বনহুর।

তাড়াতাড়ি লৌহখাঁচার দরজা খুলে সংজ্ঞাহীন রাণী আর মাসুমাকে বের করে আনলো বনহুর। তাদের জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলো। রাণী আর মাসুমাকে কিভাবে অজ্ঞান করা হয়েছিলো বুঝতে পারে না সে।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাসুমা রিজভী আর রাণীর সংজ্ঞা ফিরে এলো। তারা বনহুরকে সামনে দেখে খুশি হলো কিন্তু তাদের মাথাটা তখনও ঝিম্ ঝিম্ করছিলো বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলো না।

বনহুর বললো–রাণী, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি ইঞ্জিনকক্ষে যাচ্ছি……

না বনহুর, তুমি যেওনা, আবার সেই লৌহমানুষ তোমাকে বন্দী করবে। উঃ! কি ভয়ংকর শক্ত সে হাত।

তুমিও এসো রাণী আমার সঙ্গে। মাসুমা, এখানেই অপেক্ষা করো। আশা করি আর কোনো বিপদ আসবেনা। এ জাহাজের যিনি হিরো সে সলিল সমাধি লাভ করেছে।

বনহুর আর রাণী জাহাজের ইঞ্জিন ক্যাবিনের দিকে এগুলো, যে ক্যাবিনে চালকের আসনে বসে আছে লৌহমানুষ। বনহুর আর রাণী ক্যাবিনে প্রবেশ করে তাকালো চালকের আসনের দিকে। একটি যান্ত্রিক মানুষ হ্যান্ডেল চেপে ধরে আছে।

বনহুর বললো–রাণী, ঐ যে লোকটা দেখছো সে এখন সম্পূর্ণ অকেজো, তাকে যে ব্যক্তি চালাচ্ছিলো সে নেই। জাহাজ আপন গতিতে চলছে।

বললো রাণী–বনহুর, তাহলে আমরা এখন ভাসমান দিশেহারা যাত্রী।

হ্যাঁ রাণী, এখন আমাদেরই চালনা করতে হবে এই যান্ত্রিক মানুষগুলোকে। তুমি আমাকে সাহায্য করবে, কেমন?

যেখানে বসে জাহাজের অধিনায়ক যান্ত্রিক মানুষগুলোকে সুইচ টিপে পরিচালনা করছিলো সেখানে এসে বসলো বনহুর। সুইচ টিপতে লাগলো। এবার যান্ত্রিক নাবিক নড়ে উঠলো এবং তার হাত দু'খানা হ্যান্ডেল ঘোরাতে লাগলো।

রাণী আনন্দধ্বনি করে বললো–বনহুর, তুমি সত্যি বুদ্ধিমান। আশা করি এবার আমরা পথ খুঁজে পাবো।

*

যান্ত্রিক নাবিকচালিত জাহাজখানা বনহুর, দস্যুরাণী ও মাসুমাকে নিয়ে ভেসে চললো অজানার পথে। কৌশলে বনহুর সুইচ টিপে যান্ত্রিক নাবিক দ্বারা

জাহাজখানাকে চালিয়ে নিয়ে চললো। এ ব্যাপারে রাণী তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে।

মাসুমা তাদের খাবারের আয়োজন করে, বনহুর আর রাণীকে খেতে দিলো। একটি ক্যাবিনে নানা ধরনের খাবার সজ্জিত ছিলো। শুকনো পাউরুটি, মাখন, জেলি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি। কাজেই তাদের খাবারের জন্য আর ভাবনা রইলো না। সত্যি তাদের ভাগ্য প্রসন্ন। বলতে হবে। জীবনে আর বাঁচবে এমন ভরসা ছিলো না, এবার তাদের মনে সাহস এসেছে। যা থোক তারা একদিন তীরে এসে পৌঁছবে, তারপর তারা ফিরে যাবে। তবে মাসুমাকে তার পিতার নিকটে না পৌঁছে দিয়ে কিছু করবে না বা কোথাও যাবে না।

মাসুমার মন বড় বিষণ্ণ, সে জানে তার বাবা-মা সহজে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন না সমাজ নিয়ে তাদের বসবাস করতে হয়। যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তারা দুস্কৃতিকারী এ কথা সবাই জানে, কাজেই মাসুমা কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে বাবা-মার সামনে।

সব কথা মাসুমা রাণীকে বলেছে, মনের ব্যথা ব্যক্ত করেছে সে রাণীর কাছে। রাণী সান্তনা দিয়েছে এবং তার দায়িত্বভার নিজে গ্রহণ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। তবুও কি মন ভরে মাসুমার, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে অহরহ দগ্ধীভূত করে।

মাঝে মাঝে ডেকের ধারে এসে দাঁড়ায় মাসুমা।

উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকে সাগরের গভীর জলরাশির দিকে।

রাণী এসে পাশে দাঁড়ায়।

কাঁধে হাত রাখে মাসুমার।

চমকে ওঠে মাসুমা।

তাড়াতাড়ি সে গন্ডে গড়িয়ে পড়া অশ্রু হাতের পিঠে মুছে ফেলে নিজেকে সামলে নেয়।

রাণী হেসে বলে-আবার ভাবছ?

মাসুমা ধরা গলায় বলে-কই না তো। কিছু ভাবছি না।

মিথ্যা কথা। রাণী মাসুমার চিবুকটা উঁচু করে ধরে-সুস্নেহে বলে-মিছামিছি তুমি ভাবো মাসুমা। মানুষের জীবন বৈচিত্রময়। কত ঘাত প্রতিঘাত আসবে, কত পরিবর্তন আসবে, সব মেনে নিতে হবে যে বোন। এসো আমার জীবন কাহিনী তোমাকে শোনাই।

মাসুমার হাত ধরে রাণী নিয়ে যায় ডেকের ওধারে। একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে রাণী আর মাসুমা।

মাসুমা তাকালো রাণীর মুখের দিকে, অপরূপ সুন্দর দীপ্ত সে মুখে নেই কোনো ঝড়ঝঞ্ঝার ছাপ। কত বিপদই না যাচ্ছে তাদের ওপর দিয়ে তবুও কোন ক্লান্তি অবসাদ নেই–অদ্ভুত এ নারী।

বলে রাণী–কি ভাবছো মাসুমা?

মাসুমা একটু ম্লান হেসে বলে-ভাবছি সত্যি তুমি অদ্ভুত মেয়ে।

অর্থাৎ?

অন্যান্য মেয়ের মত তুমি সাধারণ নও।

আমার পোশাক পরিচ্ছদে না অন্য কিছু?

তোমার সব কিছুই আশ্চর্য-মাসুমা লক্ষ করেছে নারী হলেও রাণীর পরনে প্যান্ট সার্ট হাঁটু অবধি বুট, কতকটা শিকারীর পোশাকের মত। মাথায় ক্যাপ। এতো ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও রাণীর ক্যাপটা তার মাথা থেকে বিচ্যুত হয়নি কারণ তার চিবুকের সঙ্গে ক্যাপটার ফিতা ভাল ভাবে আটকানো থাকে।

মাসুমার মনে নানা প্রশ্ন জাগে।

হেসে বলে রাণী আমাকে সব সময় অশ্বারোহণ করতে হয় সে জন্য এ পোশাক আমার জন্য বাঞ্ছনীয়। আর আমাকে বড় কঠোর কঠিন বলে মনে হয় তার কারণ কি জানো। কখনও আমি দয়াবতী, কখনও আমি হৃদয়হীনা পাষাণী.....এই যে আমার হাত দু'খানা দেখছো এ হাতে আমি বহু জীবন নিঃশেষ করে দিয়েছি.....

বলো কি রাণী!

হ্যাঁ বোন, তুমি যা ভাবছো তা সত্যি। আমি অদ্ভুত এক বিস্ময়কর নারী। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে রাণী, তার দৃষ্টি চলে যায় দূরে বহু দূরে সাগরবক্ষের জলরাশির দিকে। তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো অতীতের স্মৃতি যা তাকে আজও বিস্মিত করে যখন সে গভীরভাবে নিজকে নিয়ে ভাবে।

মাসুমা আগ্রহ ভরে তাকিয়ে আছে রাণীর মুখের দিকে।

রাণী বলতে শুরু করলো-এমনি একদিন কোনো এক জাহাজে এক মালিক তার স্ত্রী কন্যা নিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলো তার কিছু লোকজন ও প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার। বসুন্ধরার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন বণিক ও তার স্ত্রী ও একমাত্র শিশু কন্যা। তারা ভাবতেও পারেনি কোনো এক মুহূর্তে তাদের জীবনে চরম এক বিপদ আসতে পারে।

বণিক ও তার স্ত্রী শিশুকন্যাকে নিয়ে তাদের ক্যাবিনে বসে ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে এক জলদস্যুদল হানা দিলো তাদের জাহাজে। মার মার কাট কাট শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো গোটা জাহাজখানা। চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগলো তীব্র করুণ মরণ চিৎকার-বাঁচাও বাঁচাও! কিন্তু কে কাকে বাঁচাবে, সবাই ভীত-আতঙ্কিতভাবে জাহাজে ছুটাছুটি করছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো রক্তাক্ত মৃতদেহ। জলদস্যুরা যাকে যেখানে পাচ্ছে নির্মমভাবে হত্যা করছে।

মাসুমা অবাক হয়ে বললো–ওদের কি মায়াদয়া কিছু ছিলো না?

জলদস্যুদের আবার মায়াদয়া। ওরা নরপশু, শয়তান। যা তারপর কি বলছিলাম?

যাকে যেখানে পাচ্ছে নির্মমভাবে হত্যা করছে।

হ্যাঁ, গোটা জাহাজখানা যাত্রীদের করুণ হৃদয়স্পর্শী আর্তনাদে ভরে উঠলো, প্রায় সবাই নিহত হলো জলদস্যুদের হাতে। রক্তস্রোত বয়ে চললো জাহাজখানার ডেকে এবং ক্যাবিনে। সেই বণিক স্ত্রী-শিশুকন্যা নিয়ে জীবন রক্ষার্থে মরিয়া হয়ে উঠলেন। ঐ মুহূর্তে জলদস্যু সর্দার সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। ভীত-আতঙ্কিত বণিক হাত জুড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন কিন্তু নির্দর জলদস্যু সর্দারের মনে একটুও দয়া হলো না। বণিক স্ত্রীর শরীরের স্বর্ণালঙ্কার তার মনে লোভ জাগিয়ে দিলো।

বণিকের-স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালো জলদস্যু সর্দার। ছিনিয়ে নিতে গেলো তার দেহের অলঙ্কার। সেই মুহূর্তে বণিক খান বাহাদুর স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো জলদস্যুর উপর। জলদস্যু বণিককে হত্যা করার জন্য আঘাত হানলো, স্ত্রী তার পূর্বেই স্বামীকে বাঁচানোর জন্য ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু রক্ষা করতে পারলেন না স্বামীকে এবং স্বামীও বাঁচাতে পারলেন না স্ত্রীকে। দুটি রক্তাক্ত দেহ ক্যাবিনের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

তারপর রাণী? তারপর?

শিশুকন্যা পিতামাতার এ অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম হলো না, কিন্তু সে বুঝতে পারলো তার পিতামাতা মৃত্যুবরণ করেছে। শিশুকন্যাটি মায়ের বুকে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। সে কান্না আর থামতে চায় না। এ দৃশ্য জলদস্যুর হৃদয়হীন হৃদয়েও হয়তো বা আঘাত করলো। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তার দু'চোখ ছাপিয়ে হয়তো পানি এসেছিল সেদিন। তাই সে এগিয়ে গিয়ে বুকে তুলে নিয়েছিলো সেই অসহায় শিশুকন্যাটিকে।

সত্যি বড় আশ্চর্য এ গল্প। তারপর?

জলদস্য সেই শিশুকন্যাটিকে বুকে নিয়ে ফিরে এলো তার আস্তানায়। তখন শিশুকন্যা ঘুমিয়ে পড়েছে জলদস্যুটির বুকে। তারপর সেই শিশুকন্যা জলদস্যুকে আপন মনে করে নিলো। আবার গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো রাণী। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকচিরে বেরিয়ে এলো। তারপর আবার সে বলতে শুরু করলো-ধীরে ধীরে সেই শিশুকন্যা বড় হতে লাগলো। সে জলদস্যু সর্দারকেই তার পিতা বলে জানো। জলদস্যু সর্দার নিজে কিছু লেখাপড়া জানতো তাই সে তার কন্যাকে শেখালো। ভাল ইংরেজি জানতো সর্দার কারণ সে একজন ভিনদেশী ছিলো। এ কারণে তার দলভুক্ত যারা তারা সবাই ইংরেজি ভাষায় কথা-বার্তা বলতো। এক দিন সেই শিশুকন্যা তরুণী হলো, তার ওপর এলো কঠিন এক দায়িত্ব। তারপর সেই শিশুকন্যা একদিন দস্যনেত্রী হলো নাম তার ক্যাথেলিন হান্টার। শিশুকালের নাম তার তলিয়ে গেলো দস্যুনেত্রী ক্যাথোলিন হান্টারের আড়ালে।

দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে মাসুমা! রাণী তাকে তার নিজের জীবন কাহিনী বলবার জন্য জাহাজের এক প্রান্তে নিয়ে এলো এবং সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে লাগলো-তবে এ কার জীবন কাহিনী.....

কি ভাবছো মাসুমা? ঐ সেই সেদিনের অসহায় শিশু আজকের দস্যুরাণী……

আপনি, আপনিই সেই দস্যুনেত্রী?

হ্যাঁ মাসুমা, আমিই সেই হতভাগিনী…..যে জানে না চেনে না কারা তার পিতামাতা ছিলেন। জলদস্যু সর্দার যে কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলো আমি তাই বললাম তোমার কাছে। মাসুমা, আমার জীবন একটি বৈচিত্রময় কাহিনী। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার জীবন কাহিনী বৈচিত্র্যে ভরা নয়।

রাণী আপনি…..কিছু বলতে যাচ্ছিলো মাসুমা।

মাসুমার কথা শেষ হয় না হঠাৎ বনহুর আনন্দধ্বনি করে এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে। বললো–রাণী, আমি নতুন একটি জিনিস আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি যা অতি বিস্ময়কর।

কি বলছো বনহুর! বললো রাণী।

মাসুমাও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

বনহুর বললো–এসো তোমরা আমার সঙ্গে।

রাণী এবং মাসুমাকে সঙ্গে নিয়ে বনহুর একটি ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। বিরাট আকার ক্যাবিন বটে, একপাশে একটি ক্যামেরা অপর পাশে একটি পর্দা-কতকটা টেলিভিশন পর্দার মত। কয়েকটি যান্ত্রিক মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এলোমেলোভাবে। বনহুর রাণীকে লক্ষ্য করে বললো–জাহাজটির মালিক সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় এরা তাদের চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছে! ঐ দেখো যে যেখানে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্চর্য হয়ে রাণী আর মাসুমা দেখছিলো। যান্ত্রিক মানুষগুলো যেন জীবন্ত আর সজীব হয়ে উঠবে এই মুহূর্তে। ওদের চোখ দুটো জ্বলছে হিংস্র জীবের মত।

বনহুর বললো–এসো রাণী দেখবে এসো।

রাণী আর মাসুমা পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর একটা সুইচ টিপলো সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠলো একটি গুহার ছবি। অদ্ভুত ধরনের গুহা, চারপাশে নানা ধরনের মূর্তি, মাঝখানে একটা গোল টেবিল। টেবিলে বসে কয়েকজন লোক কথাবার্তা বলছে।

হঠাৎ চিৎকার করে মাসুমা বলে উঠলো–ঐ যে ওধারে বসে যে লোকটা সেই তো বিশ্বাস চাচা....যে আমাকে আমার বাবা মার কাছ হতে ছিনিয়ে এনেছেবড় শয়তান......ও মরেনি...ঐ দেখুন কেমন ভদ্রতার মুখোস পরে কথা বলছে.....

বনহুর বললো–মাসুমা তাহলে তোমার শত্রুদের সঙ্গে এই যান্ত্রিক জাহাজখানার যোগাযোগ ছিলো।

রাণীর দু'চোখেও বিস্ময়, বললো সে-ঠিক বলেছো বনহুর। মাসুমা রিজভীর বাবার বন্ধু সাধুতার মুখোশপরা নরশয়তানের দলের সঙ্গে এই জাহাজের অধিনায়কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিলো। তুমি অপর সুইচগুলো টিপে দেখো ওদের কথাবার্তা শোনা যায় কিনা। এখন তো শুধু ওদের কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বনহুর রাণীর কথামতো পাশের সুইচ টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে ওই নরশয়তানদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো।

আনন্দধ্বনি করে উঠলো রাণী।

বনহুর বললো–তোমার অনুমান সত্য রাণী। ওদিক থেকে তখন কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে.....তোমরা জানোনা জাহাজ মাংলাং এখন ক্যাপটেন আলডানাসের হস্তচ্যুত হয়েছে.....এই দেখো সংকেতসূচক আলো জ্বলছে.....

মাসুমা বললো......বিশ্বাস চাচার গলা। এ কণ্ঠস্বর আমার অতি পরিচিত.....আপনারা বিশ্বাস চাচার হাত থেকে রেহাই পাবেন না। ওই তো তারা সামনের আলোর বালবগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। আপনারা ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না। ওরা কত বড় শয়তান। বিশ্বাস বড় অমানুষ–

বনহুর শান্ত গলায় বললো–মাসুমা, বোন আমি ঠিকই ধরেছি...বিশ্বাস বড় অবিশ্বাসী লোক কিন্তু আমি যাকে পরপারে পাঠালাম আমি যাকে হত্যা করলাম......যে তোমার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছিলো সে।

হ্যাঁ তারা বিশ্বাসের লোক এবং সেই জাহাজে বিশ্বাস ছিলো। আপনি যাদের হত্যা করেছিলেন হয়তো তার মধ্যে বিশ্বাস ছিলো না।

বনহুর একটা শব্দ করলো–হু।

বনহুর আর রাণী অনেক কিছুই আবিষ্কার করলো। এবং একটির পর একটি সুইচ টিপে সব জানতে পারলো। এ জাহাজের সঙ্গে কোনো এক কুচক্রী দলের যোগাযোগ রয়েছে। অবশ্য এখন তারা এ জাহাজ থেকে কোনো সংকেত পাচ্ছে না। বনহুর যান্ত্রিক নাবিক দ্বারা জাহাজখানাকে চালিয়ে নিয়ে চললো তবে কোথায় কোন্ পথে চলেছে তা এখনও তারা বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে সুইচ টিপে সেই গুহা তারা দেখতে পায় এবং তাদের আলাপ আলোচনা সব জেনে নেয়। তবে সর্বক্ষণ তারা সেই গুহায় থাকে না, তারা মাঝে মাঝে সেই গুহায় বসে আলোচনা করে যা বনহুর রাণী মাসুমা স্পষ্ট শুনতে এবং দেখতে পায়।

যান্ত্রিক নাবিক হঠাৎ একদিন বিগড়ে গেলো। বনহুর বুঝতে পারলো কোনো সুইচ। টিপতে তারা ভুল করেছে। জাহাজখানা এলো পাতাড়ি ছুটছে। কোথায় চলেছে কে জানে।

বনহুর ও রাণী নানা চেষ্টা করেও জাহাজখানাকে সঠিকভাবে চালাতে সক্ষম হলো না।

বনহুরের মুখমন্ডলে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো। হঠাৎ এমন অবস্থায় পড়বে ভাবতে পারেনি সে। বনহুর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলো জাহাজখানাকে বাগে আনার জন্য।

এমন সময় রাতের অন্ধকার নেমে এলো সাগরের বুকে। শুধু রাতের অন্ধকার নয়, জমাট মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেললো অন্ধকার আকাশটিকে। বনহুর আর রাণী ব্যস্ত হয়ে পড়লো। একে তো জাহাজখানা এলোপাতাড়ি ছুটছে তারপর ঝড় ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলো।

জাহাজের ইঞ্জিনটি ছিলো অদ্ভুত ধরনের যা যান্ত্রিক মানুষ দ্বারা চালিত হতো। অন্যান্য জাহাজের মত এ জাহাজের ইঞ্জিন নয়, এর মেসিন ও যন্ত্র বয়লার অন্য ধরনের ছিলো। রাণী ও বনহুর কিছুতেই জাহাজখানাকে অন্য জাহাজের মত সঠিকভাবে চালাতে পারছে না। ভীষণভাবে দুলছে জাহাজখানা। যে কোনো

মুহূর্তে ডুবন্ত পর্বতমালার সঙ্গে ধাক্কা খেলে তাদের জাহাজখানা ফেসে যেতে পারে।

জমাট অন্ধকারে ঝড়ের বেগে ছুটছে জাহাজখানা।

আকাশেও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হলো সাইক্লোন, মেঘের হুঙ্কার এবং তার সঙ্গে সাগরের প্রচন্ড গর্জন। মাসুমার মুখে ভীত আতঙ্ক ভাব ফুটে উঠলো।

রাণী আর বনহুর কোথায় হারিয়ে গেলো জমাট অন্ধকারে।

জাহাজখানাকে রক্ষার জন্য মেতে উঠলো বনহুর আর রাণী।

মাসুমা দিশেহারার মত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না, ঝড়ের ঝাপটায় কখনও বা পড়ে যাচ্ছে, কখনও বা এটা ওটা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ প্রচন্ড একটা শব্দে জাহাজখানা ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড বিস্ফোরণ। সমস্ত জাহাজখানা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো সাগরবক্ষে।

কে কোথায় হারিয়ে গেলো কেউ বুঝলো না।

*

রহমান তার অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে দাঁড়াতেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে এগিয়ে এলে কায়েস,. তার হাতে একটি লাল রঙের চিঠি। বললো কায়েস-একটি দুঃসংবাদ রহমান ভাই।

রহমান অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে দাঁড়িয়ে তার অশ্বের পিঠ চাপড়ে দিলো। তারপর কায়েসের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলো-বনহুর, তুমি আত্মগোপন করে কতদিন থাকবে। তোমার দস্যু জীবনের অবসান চাই। আজ তোমার পুত্র নূরকে আমরা তুলে নিয়ে এসেছি। যদি তুমি আমাদের কথায় রাজি হও তাহলে নূর মুক্তি পাবে নচেৎ তার ছিন্নমস্তক তোমাকে উপহার দেওয়া হবে।

—দেওরাজ

অস্ফুট কণ্ঠে বললো রহমান–দেওরাজ.....অদ্ভুত নাম!

কায়েস বললো–রহমান ভাই, কান্দাই শহরের আস্তানা থেকে মাহবুব এ চিঠিখানা নিয়ে এসেছে। এ চিঠিখানা নূরের বাসভবনে তার শয়নকক্ষে পাওয়া গেছে। কথাগুলো চিন্তিত কণ্ঠে বললো কায়েস।

রহমান ভ্রূকুঞ্চিত করে পুনরায় তাকালো চিঠিখানার দিকে।

তার মুখমন্ডল গম্ভীর মনে হলো, নূরকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। এরা কারা? মনে মনে ভাবলো রহমান।

রহমান ভাই, তুমি নূরকে খুঁজে বের করো নাহলে তাকে ওরা হত্যা করবে। কথাগুলো বললো কায়েস।

কোনো দল গোপনে স্বার্থসিদ্ধির আশায় এ কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কায়েস তুমি বলে দাও আমাদের প্রতি অনুচর যেন কান্দাই শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিটি হোটেল ও যানবাহনে তারা যেন লক্ষ রাখে কারণ তুমি ঠিক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। নূরকে যারা হরণ করেছে তারা নিশ্চয়ই

এমন সময় জাভেদ এসে দাঁড়ালো।

মুখে তার স্মিত হাসির রেখা। বললো সে–কি সংবাদ রহমান চাচা?

আপনাদের মুখমন্ডল বড় গম্ভীর লাগছে?

রহমান জাভেদের মুখে দৃষ্টি রেখে বললো–বড় দুঃসংবাদ জাভেদ। নূরুজ্জামানকে কে বা কারা তার শয়নকক্ষ হতে তুলে নিয়ে গেছে।

নূরুজ্জামান মানে সেই পুঁচকে গোয়েন্দা?

জাভেদ, যাকে তুমি পুঁচকে গোয়েন্দা বলছো সে মোটেই পুঁচকে নয়। তার সুনাম সমস্ত কান্দাইবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

হাসলো জাভেদ, তার মুখে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে। রহমান বললো–জাভেদ, তুমি যাকে অবহেলা করছে তার আরও একটা পরিচয় আছে। বললো সেদিন যেদিন নূরকে আমরা খুঁজে বের করতে পারবো। জাভেদ, তুমি আমাদের সাহায্য করবে।

জাভেদ বললো–আমার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন হবে না রহমান চাচা, তুমিই তাকে খুঁজে বের করো।

কথাটা রাগতভাবে বলে জাভেদ চলে গেলে সেখান থেকে।

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলো ফুল্লরা, এগিয়ে এলো সে ডাকলো–জাভেদ শোন।

থমকে দাঁড়ালো জাভেদ।

ফুল্লরা বললো–শুনেছি নূরুজ্জামান সর্দারের পরম আদরের জন। শোন জাভেদ, তুমি আব্বুকে সাহায্য করো। নূরুজ্জামানকে শত্রুহস্ত থেকে উদ্ধার করো।

ফুল্লরা আমি কি করে জানবো সে কোথায়? আর কারাই বা তাকে ধরে নিয়ে গেছে....

পারবে। তুমি পারবে জাভেদ। তাকে তুমি খুঁজে বের করতে পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করবো জাভেদ।

বেশ তুমি বলছো আমি রহমান চাচার সঙ্গে তল্লাশি চালাবো, কিন্তু নূরকে আমি পছন্দ করি না।

কিন্তু কেন তুমি তাকে পছন্দ করো না?

শহুরে জীব হয়ে সে এসেছিলো আমাকে হন্তদন্ত করতে। সে জানে না আমি তাকে হরিণ শিশুর মত হত্যা করতে পারি।

তুমি বড় নির্দয় জাভেদ। নূরকে সর্দার ভালবাসে কাজেই তুমি তাকে সমীহ করে চলবে এটাই আমি চাই।

সর্দার কাকে ভালবাসে তা আমি জানতে চাই না ফুল্লরা। তুমি চলে যাও আমার কাছ থেকে। আমি একা থাকতে ভালবাসি।

এ কথা আমি জানি জাভেদ, আর জানি বলেই তোমাকে বিরক্ত করতে আসি না...কথাটা বলে ফুঁপিয়ে কাঁদে ফুল্লরা। তার সুন্দর গন্ডদ্বয় রক্তাভ হয়ে ওঠে।

জাভেদ একবার একটু তাকিয়ে দেখলো তারপর সে চলে গেলো সেখান থেকে।

রহমান আর কায়েস তখন দরবারকক্ষে প্রবেশ করে পাশাপাশি বসেছে। রহমানের হাতে সেই লাল রঙের চিঠি যে চিঠিতে লেখা আছে-বনহুর তুমি আত্মগোপন করে আর কতদিন থাকবে.....

বললো রহমান–কায়েস, কিছুদিন পূর্বেই শত্রুপক্ষ নূরকে কৌশলে বন্দী করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। তাকে এমনভাবে নির্যাতিত করা হয়েছিলো যে, তাকে জীবিত পাবো এমন আশা আমরা করতে পারিনি। ভাগ্য প্রসন্ন ছিলো তাই তুমি তাকে সুকৌশলে রক্ষা করেছিলে।

হা রহমান ভাই, এ কথা সত্য। শত্রুগণ নূরকে কৌশলে বন্দী করে তাকে আহত অবস্থায় কান্দাই পর্বতমালা থেকে নদী গর্ভে নিক্ষেপের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলো। আমি জানতে পারি এবং আমার কয়েকজন সঙ্গীসহ অশ্ব নিয়ে ছুটে যাই...... তারপর বহু কষ্টে তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এরপর সবই তুমি জানো।

শুধু তাই নয়, বৌরাণী মনিরাকেও শত্রুগণ কি ভাবে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো। সর্দার তাকে উদ্ধার করতে পেরেছিলো বলেই আজও বৌরাণীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাকে সাগর তলে কোন এক গোপন পর্বত গুহায় আটক করে রেখেছিলো নরশয়তান চৌধুরী। যাকে সর্দার সাগর তলেই নিঃশেষ করে দিয়েছিলো.....একটু থেমে বললো রহমান–আমার মনে হয় ঐ দলের লোকরাই এখন কাজ করছে। নাহলে নূরকে তারা হরণ করবে কেন?

রহমান ভাই এ কথা সত্য কান্দাই শহরেই তারা লুকিয়ে আছে.....

এখানে যখন রহমান ও কায়েস তাদের দরবারকক্ষে বসে কিছু গোপন আলাপ আলোচনা করছিলো তখন কান্দাই শহরের ভূগর্ভে কোনো এক জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়েছে গোয়েন্দা নূরুজ্জামান চৌধুরীকে। তার হাত দু'খানা পিছমোড়া

করে বাঁধা। মুখেও রুমাল বাঁধা, তার সমস্ত শরীরে চাবুকের দাগ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দুটি লোক তার দু'পাশে দন্ডায়মান। তারা মাঝে মাঝে চাবুক দিয়ে তার শরীরে আঘাত করছে।

সম্মুখে দন্ডায়মান এক ব্যক্তি, হাতে তার রিভলভার। দাঁতে দাঁত পিষে বলছে লোকটা-যদি তোমার পিতা তোমার জীবনের বিনিময়ে আত্মোৎসর্গ করে তাহলে তোমার মুক্তি, নচেৎ নয়। তোমার ছিন্নমস্তক তোমার মহামান্য দস্যুপিতাকে উপহার দেয়া হবে।

নূর কঠিন কণ্ঠে বললো–তোমাদের আমি ঘৃণা করি। কোনো জবাব তোমরা পাবে না আমার কাছে।

সত্যি জবাব দেবে না?

না।

পুনরায় কষাঘাতে জর্জরিত করে ফেললো ওরা নূরকে।

জীবনে একবার দু'বার নয়, কয়েকবার সে শত্রুকবলে পড়ে নিষ্পেষিত হয়েছে। যদিও শক্তি বুদ্ধিতে সে কম ছিলো না, তবুও তাকে কয়েক দফা পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছে চতুর শয়তানদলের কাছে। শত্রুপক্ষের নেতা বল্লম সেন দেওরাজ ছদ্মনামে নিজকে প্রকাশ করেছিলো, এবং গোপনে তার দলবল শুধু কান্দাই নয়, সমস্ত বিশ্বে শাখা বিস্তার করে নরহত্যা, নারী-হরণ এবং দেশের ধন-সম্পদ বিদেশে পাচার কাজ চালিয়ে চলেছিলো। বল্লাম সেন আজ দেওরাজ নামে নতুনভাবে আত্ম প্রকাশ করেছে। প্রথম জীবনে সে ঝম নগরে এক সন্ন্যাসীবেশে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঝাম নগরে নানাধরনের দুষ্কর্ম করেছে, তারপর সন্ন্যাসীবেশি শয়তান ঝামরাজকন্যাকে অপহরণ করে। রাজকন্যাকে হারিয়ে ঝামরাজ মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত রাজ্যে চরম একটা অশান্তি বিরাজ করছিলো।

সংবাদ পেয়ে বনহুর নিশ্চুপ থাকতে পারেনি।

রহমানসহ বনহুর চলে এসেছিলো ঝমরাজ্যে এবং সন্ন্যাসীবেশি হরসিং নামধারী বল্লম সেনের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়-তবে প্রকাশ্যে নয় কৌশলে। হরসিং বনহুরের কাছে পরাজিত হয়। তাকে বনহুর হত্যা করার পূর্বে সে পালিয়ে যায় আঁম ছেড়ে। বনহুর রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজার নিকটে পৌঁছে দেয়। তারপর ফিরে আসে সে নিজ আস্তানায়।

হরসিং প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধীভূত হয়। সে নাম পালটে ফেলে এবং কান্দাই শহরের এক গোপন স্থানে আড্ডা গেড়ে বসে। তার দলবল ছড়িয়ে পড়ে শহরে, নানা বেশে তারা বনহুরের সন্ধান করে ফিরছিলো। সুযোগমত নারীহরণ, শিহরণ এবং খুনজখম রাহাজানি করে বেড়াচ্ছিলো। দস্যু বনহুরের নামে সে নিজেকে চালিয়ে নিচ্ছিলো।

হরসিং কান্দাই এসে পুনরায় তার নাম পাল্টে ভীমরাজ নামে নিজকে প্রকাশ করেছিলো। যত গোপনেই ভীমরাজ কান্দাই শহরে আত্মগোপন করে দুষ্কর্ম চালিয়ে যাক না কেন বনহুর তার সন্ধান জানতে এবং শেষ পর্যন্ত ভীমরাজকে নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে।

চতুর ভীমরাজ যখন বুঝতে পারলো কান্দাই ত্যাগ করা ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না, তখন সে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো মন্থনাদ্বীপে। কিন্তু মন্থনায় সে ভাল ব্যবসা করতে পারেনি। দুর্ভিক্ষ আর হাহাকারে ভরা মন্থনায় কিছুদিন কাটানোর পর সে ফিরে আসে হীরাঝিলে।

সন্ন্যাসীবেশে বেশ কিছুদিন সে হীরাঝিলে বসবাস করে। সেখানেও সে ভাল সুবিধা করতে না পেরে আবার যায় ঝম শহরে। কিন্তু সর্বক্ষণ তার দৃষ্টি ছিলো বনহুরের ওপর। কেমন করে ভীমরাজ বনহুকে কাহিল করবে এটাই ছিলো তার প্রধান লক্ষ্য। পুলিশ মহলের চোখে ধূলো দেওয়া সম্ভব হলেও বনহুরের চোখে ফাঁকি দেওয়া ভীমরাজের পক্ষে সম্ভব হলো না। একদিন ভীমরাজবেশি নরশয়তান হরসিং ধরা পড়লো বনহুরের কাছে। ঐ মুহূর্তে ইচ্ছা করলে বনহুর তাকে হত্যা করতে পারতো কিন্তু ভীমরাজকে সেদিন ক্ষমা করেছিলো বনহুর বলেছিলো-ভীমরাজ, তুমি যেই হও তোমার আসল পরিচয় আমি জানতে চাই না, কারণ তাতে আমার কোনো উপকার হবে না। একবার নয়, তুমি কয়েক বার নাম পালটে বিভিন্ন নামে আমার দেশবাসীর সর্বনাশ করেছে। তবুও তোমাকে এবার আমি ক্ষমা করলাম। আর কোনোদিন তুমি অসৎ কর্ম করবে না।

সেদিন বনহুরের রিভলভার ভীমরাজের বুকের পাঁজর ভেদ করে চলে যেতো। আর কোনোদিন সে পৃথিবীর আলো দেখতে পারতো না। শপথ গ্রহণ করা তার মত অসৎ ব্যক্তির জন্য মোটেই বনহুর পছন্দ করেনি তাই তাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখেনি নিজের রিভলভারের মুখে। পদাঘাতে তাড়িয়ে দিয়েছিলো তাকে কুকুরের মত।

সেই ভীমরাজ আজ আবির্ভূত হয়েছে দেওরাজ নাম ধারণ করে। রহমান বুঝতে পারে, দেওরাজ যেই হোক সে এমন এক জন নরাধম যে বনহুর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। সে জানে, বনহুর তার জীবনে একটি বিরাট বাধা।

রহমান কিছু সময় কায়েসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিলো, তারপর বেরিয়ে পড়লো অশ্য নিয়ে। চিঠিখানা সে সঙ্গে রাখলো।

*

রহমানের অশ্বপদশব্দ প্রতিধ্বনিত হলো কান্দাই জঙ্গলের অভ্যন্তরে। নূরী এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো, এবার সে বেরিয়ে এলো। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো, না জানি বনহুর এখন কোথায়। সে জীবিত আছে কিনা তাই বা কে জানে। বলেছিলো বনহুর, নূরী তুমি তো জানো আমি বিপদকে ভয় পাই না। বিপদকে আমি আলিঙ্গন করি। বিপদকে জয় করাই আমাদের নেশা। যদি কোনো দিন বিফল হই তবে মনে করবে সেটাই আমার জীবনের চরম পরাজয় .....তবে কি বনহুর পরাজিত? না, না, তা হয় না, বনহুর কারও কাছে কোনো দিন পরাজয় বরণ করবে না, তার মন বলছে সে ভাল আছে, জীবিত আছে।

এমন সময় জাভেদ এসে দাঁড়ালো তার মায়ের পাশে। মুখমন্ডল গম্ভীর, কিছু বলতে চায় সে। মাকে চিন্তামুক্ত দেখে জাভেদ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

নূরী নিজকে সংযত করে নেয়। বনহুরের কথা স্মরণ করে নূরীর দুচোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে। চট করে কোনো কথা নূরী বলতে পারে না। বনহুরকে নূরী স্বামী হিসেবে পেলেও আজও তাকে সে বন্ধুর মত, পরম সাথীর মত ভালবাসে। এ কথা সত্য নূরীর জ্ঞান হবার পর সে কাছে পেয়েছিলো বনহুরকে। একই সঙ্গে ওরা খেলা করতো, ঝরনার বুকে সাঁতার কাটতে। বনে বনে পশুপাখী শিকার করে বেড়াতো। একদিন যে সঙ্গী ছিলো, বন্ধু ছিলো তাকে সে স্বামী রূপেও পেয়েছে।

কিন্তু বড় ক্ষণস্থায়ী সে জীবন। স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার নিয়ে নূরী কোনোদিন স্বামীর ওপর দাবি জানায়নি। কেমন একটা দুর্বলতা দূরীকে সব সময় বনহুরের কাছে বিনয়ী করে রাখতো। অবশ্য কারণ ছিলো বনহুর আর নূরী একসঙ্গে বেড়ে উঠলেও, নূরী বনহুরের হৃদয় জয় করতে পারেনি। ওরা মিশেছে খেলার সাথী আর বন্ধু হিসেবে। একদিন নূরী নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলো বনহুরকে সে নিজের অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেলেছে। সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে সে তাকে কামনা করে কিন্তু বনহুর কি তাকে ভালবাসে, তাকে পেতে চায়। গভীরভাবে তলিয়ে ভাবতো নূরী, তখন হতাশ হতো কারণ বনহুরের মধ্যে সে কোনোদিন এমন কোনো লক্ষণ দেখতে পায়নি যা তার মনকে নাড়া দেবে। তবুও সে তাকে ভালবাসতে মনপ্রাণ দিয়ে, আজও ভালবাসে। ওর অমঙ্গল চিন্তা করতে গেলে দু'চোখ ভরে পানি আসে। নূরী নিজেও ভাবতে পারে না কেন তার এমন হয়।

জাভেদকে দেখলে নূরী আশ্বস্ত হয়, সে তার মধ্যে খুঁজে পায় তার স্বামীর সান্নিধ্য। সত্যি জাভেদ যেন হুবহু তার পিতার প্রতিচ্ছবি, একরোখাও বটে সে পিতার মত। যখন যে জেদ সে ধরে বসে তা সে করবেই। কোনো বাধাবিঘ্ন সে মানে না। তাই নূরীর ভীষণ চিন্তা। স্বামীকে সে কাছে পেয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে নয়। যখনই বনহুর তার সান্নিধ্যে এসেছে তখনই তার মধ্যে এমন একটা ভাব নূরী লক্ষ করেছে যা তাকে আরও বেশি ব্যথিত করেছে। হয়তো কিছুক্ষণ বনহুরকে তার পাশে পেয়েছে, আবার পরক্ষণেই সরে গেছে নানা কাজের চাপে। একান্ত নিশ্চিন্ত মনে সময়ের ব্যবধান পরিহার করে ওকে কোনোদিন ধরে রাখতে পারেনি সে।

নূরী ভাবছিলো স্বামীকে নিয়ে, ভাবছিলো নূরকে নিয়ে, এমন সময় জাভেদকে পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে নূরী চোখ তুলে তাকালো, ভাল করে লক্ষ করলো ওর মুখমন্ডল। কি যেন বলতে চায় জাভেদ, কোনো সময় এমন করে পাশে এসে দাঁড়ায়নি তো। তবে কি কিছু বলবে?

কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই বললো জাভেদ–মাম্মি, ঠিক করে বলল আমার বাপু কোথায়?

জাভেদের কথার হঠাৎ কি জবাব দেবে নুরী ভেবে পায় না। তবুও বললো–আমি কেমন করে বলবো। সে তত কোনোদিন আমাকে কিছু বলে যায় না। এটা তার অভ্যাস ....

না মাম্মি, তোমাকে বলতে হবে? রহমান চাচা বলেছে সেই গোয়েন্দা টিকটিকির সঙ্গে আমার নাকি কোনো যোগ আছে। বললো মাম্মি, কি সে যোগ আর কেনই বা তোমরা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলে এই গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে? বলো মা কে সে?

নূরী বিব্রত বোধ করে। তবে কি জাভেদ কিছু জেনে ফেলেছে? রহমান তবে কি কিছু কথা বলে ফেলেছে? না না তা বলবে না রহমান কারণ সে জানে এ কথা হঠাৎ এমনভাবে বলা যায় না।

জাভেদ বললো–মাম্মি, আমি জানি তুমি কিছু ভাবছে। সত্যি করে বলো তো কি ভাবছো?

নূরী বললো–তুই কি জানতে চাস বল জাভেদ? আমি বলবো, সব বলবো। কারণ তোমার জানা দরকার?

জাভেদ পূর্বের মত তেজদীপ্ত গলায় বললো–পুঁচকে গোয়েন্দা নূর যাকে আহত অবস্থায় তোমাদের আশ্রয়ে স্থান দিয়েছিলে? যাকে তুমি নিজের হাতে সেবাযত্ন করে সারিয়ে তুলেছিলে কে সে? রহমান চাচা বলেছে তার আরও একটা পরিচয় আছে। কি সে পরিচয় বলতে হবে তোমাকে?

জাভেদ, সব কথা কি সব সময় বলা যায়। মনে কর সে তোর মত আমার আর একটি ছেলে।

না, আমি ছাড়া তোমার আর কোন ছেলে নেই। কঠিন কণ্ঠে বললো জাভেদ। চলে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিলো জাভেদ।

নূরী ওর হাত চেপে ধরলো-জাভেদ, এখন বেশ বড় হয়েছিস। সব কথা ধৈর্য ধরে শুনতে বুঝতে হয়। তোর রহমান চাচা তোকে যা বলেছে তা সত্য। নূর আজ শক্তহস্তে বন্দী, নিশ্চয়ই তাকে কৌশলে শত্রুপক্ষ সরিয়েছে। জাভেদ মনে কর সে যদি তোর ভাই হ• .....

তবুও আমি তাকে কোনো রকম সাহায্য করতাম না, কারণ সে আমার শত্রু। ফুল্লরাকে সে তুলে নিয়ে যাবার জন্য ফন্দি এঁটেছিলো। জানতো না বনহুরের আস্তানার আশেপাশে যারা বিচরণ করে তারা সবাই তারই লোক। ওর সাহস দেখে আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছি মাম্মি।

যাই বলিস, জাভেদ সব আমি দেখবো। ফুল্লরাকে সে কোনোদিন তুলে নেবে না সে ভয় করিস না জাভেদ। তোর রহমান চাচা যা বলে শুনবি। নূরকে উদ্ধার করতে যদি তোর সাহায্যের প্রয়োজন হয় করবি। বল জাভেদ, রাখবি আমার কথা?

মাম্মি, তুমি আমাকে মিছামিছি ওসব কথা বলো না। আমি যাবো নূর মানে সেই পুঁচকে গোয়েন্দাটিকে শত্রুকবল থেকে উদ্ধার করতে? না, কখনও না, সে আমার শত্রু......

জাভেদ নূরীর হাতের মুঠা থেকে হাত টেনে নিয়ে দ্রুত চলে গেলো।

নূরী জানে জাভেদ কখনও তার বাধ্য নয়, ওকে কোনো কথা বলা বৃথা। সে যদি জানতে পারে নূর তার ভাই তখন তার মনোভাব কেমন হবে তা বলা মুস্কিল। হিতে বিপরীত হতে পারে। নূরী আর কিছু না বলে চুপ রইলো কিন্তু মনের অস্থিরতা কমলো না। রহমান যা বলেছে তা সব সত্য। শত্রুপক্ষ তাহলে জানে নূরের সঙ্গে বনহুরের কি সম্বন্ধ আর সে সুযোগ নিয়েই তারা নূরকে সুকৌশলে বন্দী করেছে।

বনহুরের আস্তানায় নূরী যখন নূরকে নিয়ে ভাবছে তখন দেওরাজের গোপন আড়াখানায় নুরকে পিছমোড়া করে বেঁধে শরীরে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করছে দেওরাজ-লো নুর তোমার পিতা বনহুর কোথায়? নিশ্চয়ই তুমি জানো।

নূর কোনো জবাব দেয় না, তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেওরাজ তুলে এনেছে তার শয্যা থেকে। বাংলোর পুরোন চাকর মহসীনকে তার কক্ষে বন্দী করে রেখেছিলো। দারোয়ান এবং আর অন্যান্য যারা ছিলো তাদের সবাইকে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে তবেই এ কাজ সমাধা করেছিলো দেওরাজ। এর পূর্বেও দেওরাজ নূরকে আটক করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে ছিলো কিন্তু সে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয় বারও বিফল হয়েছিলো, জানতে পেরেছিলো নূর, তাই দেওরাজের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো সেবারও।

দেওরাজ কৌশলে নূরকে বন্দী করলেও নূর কিন্তু একটুও ঘাবড়ে যায়নি। সে বনহুরের সন্তান, তার দেহের রক্তে মিশে আছে এক দুর্জয় সাহসী রক্ত। এই মুহূর্তে সে বন্দী হলেও মোটেই নিজকে নিঃসহায় মনে করে না। নূর জানে দেওরাজ

তাকে কিছুতেই হত্যা করতে সাহসী হবে না। নুর যে বনহুরের সন্তান এবং বনহুরকে কাবু করতে হলে তার সন্তানকে বন্দী করতে হবে তা সে বেশ বুঝতে পেরেছিলো। বহুদিন হতে দেওরাজ বনহুরকে হত্যা করার জন্য উন্মাদ কিন্তু সে সফলকাম হয়নি। এবার নূরকে আটক করেছে, যেমন করে আরও এক নরপশু তেমনি কৌশলে নূরকে বিপদে ফেলেছিলো। নূর ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো তার জীবনে প্রচন্ড ঝরঝঞ্ঝা আসবে, যা পরিহার করার উপায় নেই। তাই নূর ভয় পায়নি কারণ সে দুঃসাহসী।

মাঝে মাঝে নূর বিব্রত হতো, ভাবতো অনেক কথা। যে দায়িত্বভার সে গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল। এ কাজে বিপদ আসবে, অনেক সংগ্রাম করতে হবে-আর সেই শপথ নিয়েই নূর ডিটেকটিভের পদ বেছে নিয়েছে। বয়স তার তেমন হয়নি। সবে তরুণ, জীবনের প্রথম ধাপে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নানা ঝড়ঝা–অনেক বিপদ আসছে, তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

নূর জানতো না তারই পিতা দস্যু বনহুর। আর জানতো না বলেই সে শপথ গ্রহণ করেছিলো এই বিশ্বখ্যাত দস্যুকে সে বন্দী করবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবে। বনহুরকে গ্রেপ্তার করবার স্বপ্ন তাকে অস্থির করে তুলেছিলো একদিন। আজ সে স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে, সবকিছু উদঘাটিত হয়েছে তার কাছে। বনহুরকে ভালভাবে চিনেছে, জেনেছে তার আসল পরিচয়। দেখেছে তার আসল রূপ। নূর বহুদিন নির্জনে বসে ভাবে এ কথা, যাকে বন্দী করার অভিলাষ নিয়ে সে বিদেশ গিয়েছিলো স্বনামধন্য ডিটেকটিভ হবার বাসনা হৃদয়ে নিয়ে, সে বাসনা তার পূর্ণ হয়েছে-বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করে ফিরে এসেছে কিন্তু যখন সে কাজে নামলো তখন সব ফাঁস হয়ে গেলো তার কাছে। স্বয়ং দস্যু বনহুর তার পিতা।

যখন নূর এ কথা জানলো তখন বনহুরকে সে ভালভাবে জেনেছে, অনেক গোপন তথ্য তার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। তাকে দুর্বল করে ফেলেছে, বনহুর দস্যু হলেও বিশ্বের স্বনামধন্য নামধারী নরপশুদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার মত মহৎ প্রাণ মানুষ আর হয় না। দীন-দুঃখী, অসহায় মানুষের সে পরম বন্ধু, নিঃস্ব রিক্ত যারা তারা বনহুরকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় বনহুর। বয়স কম হলেও নূরের বুদ্ধিমত্তা প্রখর।

নূর পিতাকে ক্ষমা করতো না যদি সে সত্যিই অন্যায় অত্যাচারী দুর্ধর্ষ দস্যু হতো। তার জীবন পণ রেখেও, তাকে সে শায়েস্তা করার চেষ্টা করতো। কিন্তু নূর

পরাজিত বনহুরের মহত্ত্বের কাছে। ঐ একটি হৃদয় যার তুলনা হয় না এ কালের মানুষনামী জীবগুলোর সঙ্গে। স্বার্থের সন্ধানে সবাই উন্মাদের মত ছুটছে। যারা কোটি কোটি টাকার মালিক তারাও। অস্থিরচিত্ত, কেমন করে আরও আসবে। লোভ-লালসা তাদের অন্ধ করে ফেলেছে। শান্তি পরিহার করে তারা শার্দলের মত অর্থের পেছনে দৌড়াচ্ছে, যেমন করে হায়না তার শিকারের সন্ধানে ছোটে। মাঝে মাঝে নূরের বড় হাসি পায়, এ দুনিয়ার মানুষনামী জীবগুলোর কথা ভেবে। যত পায় ততই আরও লোভ, বাড়ি, গাড়ি, ইমারৎ, কল-কারখানা ইন্ডাষ্ট্রি আছে, তবুও আরও চাই। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসতে পারে, এই বিশ্বের মোহ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, কোন শক্তিই ধরে রাখতে পারবে না যত ঐশ্বর্যের পাহাড় থাকুক না কেন। তবুও এরা শান্তি চায় না, লোভ লালসার মোহে আকৃষ্ট হয়ে উম্মাদের মত ছুটাছুটি করছে। চাই, আরও চাই-যেমন করে থোক চাই। এই চাওয়ার কি শেষ নেই। শুধু একটি মানুষকে নূর দেখেছে যার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে একটি মানুষ প্রাণ।

*

বহুনামধারী দেওরাজ নূরকে যখন কষাঘাত করছিলো তখন নূর ভাবছিলো এই হৃদয়হীন লোভ মানুষগুলোর কথা। অন্যায় আর অসৎ উপায়ে ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়েও এদের সাধ মেটেনি। এরা আরও চায়, আর সেই চাওয়ার পথ যাতে সুগম হয় এ কারণেই চায় বনহুরকে সরাতে। তাকে সরাতে পারলে অমানুষের দল রক্তচোষা বাদুড়ের মত অসহায় মানুষগুলোর বুকের রক্ত চুষে নিতে পারবে অনায়াসে।

নূর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, যে মুহূর্তে তার শরীরে চাবুকের আঘাত পড়ছিলো সেই মুহূর্তে তার ধমনির রক্ত টগবগ করে উঠলো। হাত দুখানা বাধা থাকলেও পা দুখানা তার মুক্ত ছিলো। প্রচন্ড লাথি দিলো নূর দেওরাজের তলপেটে।

সঙ্গে সঙ্গে দেওরাজ উবু হয়ে পড়ে গেলো।

আরও দু’জন দাঁড়িয়ে ছিলো তার দু’পাশে। দেওরাজ উবু হয়ে পড়ে যেতেই পাশে দন্ডায়মান দুজন নূরকে ধরে ফেললো।

নূর অবাক হলো–একজন তার হাতের বাঁধন ছুরি দিয়ে কেটে ফেলছে আর একজন তাকে ধরে আছে। কিছু ভাবছে নূর, বেশ অবাক হয়েছে সে।

এমন সময় কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো একজন-নূর, আমি তোমার রহমান চাচা

নূরের চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। সে ভাবছে কেমন করে তারা এই দুর্গম স্থানে পৌঁছলো। কিন্তু কোনো কথা বলার সময় এটা নয়। নূর নিশ্চুপ রইলো।

হাতের বাধন মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে নূর দেওরাজের বুকে প্রচন্ড ঘুষি বসিয়ে দিলো। ঐ সময় দেওরাজ তলপেট চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো। দেওরাজ ঘুষি খেয়ে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সে ভাবতে পারছে না নূরের হাত দু'খানা মুক্ত হলো কি করে। কিন্তু ভাববার সময় পেলো না, মেঝেতে পড়ে যেতেই রহমান তার সঙ্গীকে বললো–ওকে হত্যা করো মহসীন।

নূর বললো–না, এত সহজে হত্যা করো না ওকে রহমান চাচা। তারপর মহসীনের দিকে ফিরে তাকালো নূর-মহসীন চাচা, তুমি। আমি তোমাদের চিনতে পারিনি.....

রহমান বললো–এখন কথা বলার সময় নয় নূর। দেওরাজ নরপশু সে মোটেই কাবু হয়নি। এই মুহূর্তে সে পুনরায় আক্রমণ চালাবে। তাছাড়া ওদের দল আছে, ভয়ংকর ওরা।

রহমানের কথা শেষ হয় না, তাদের পায়ের তলা দুলে উঠলো। তারপর তারা একই সঙ্গে পড়ে গেলো গভীর খাদের মধ্যে।

ঐ সময় নূর ও রহমান, মহসীনের কানে পৌঁছলো দেওরাজের হাস্যধ্বনি।

হুমড়ি খেয়ে তারা গভীর অতলে পড়ে গেলো।

জমাট অন্ধকার।

নূর রহমানকে তুলে বসিয়ে দিলো তারপর হাতড়িয়ে ডাকলো–মহসীন চাচা।

মহসীন জবাব দিলো-মাথায় বড় চোট লেগেছে।

নূর বললো–রহমান চাচা তোমার কোথাও চোট লাগেনি তো?

রহমান বললো–লাগলেও তেমন নয়। ওসব সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে। ভাবছি কেমন করে হলো এটা। এততদূর গুছিয়ে এনে পরাজয় ....

চাচা, তুমি তো বললে, সব সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে। দেখা যাক কি ঘটে।

কিন্তু তোমার জন্য ভাবছি, তুমি যে বড় কাহিল

মোটেই না রহমান চাচা। যত দুর্বল তোমরা আমাকে মনে করছ ততখানি আমি নই। রহমান চাচা.....

বলা নূর?

তোমরা কি করে হঠাৎ এভাবে আমার পাশে.....

এলাম এই তো? বললো রহমান। যদিও তারা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না তবুও তারা যে পাশাপাশি রয়েছে এটা তারা বেশ বুঝতে পারছে।

বললো রহমান–ওদের চিঠি পেয়েছিলাম নূর। দেওরাজের স্বহস্তে লেখা সাবধান বাণী। সেই চিঠির মধ্যেই আমি পেয়েছি তার আড্ডাখানার পথের নির্দেশ।

বল কি চাচা! বললো নূর।

হ্যাঁ দেওরাজ জানতো না ঐ কাগজটির অপর পৃষ্ঠায় একটি অস্পষ্ট ম্যাপের ছবি ছিলো। ভুল করে সে ঐ কাগজটি ব্যবহার করেছিলো এবং সেই চিঠিখানা আমাদের আস্তানায় পৌঁছে গেছে ভাগ্যক্রমে। অস্পষ্ট হলেও আমার চোখে ফাঁকি দিতে পারেনি দেওরাজ।

নূর আনন্দসূচক শব্দ করে বললো–রহমান চাচা, সত্যিই তুমি বুদ্ধিমান। পথ চিনতে বা চিনে বের করতে নিশ্চয়ই খুব পেরেশান হতে হয়েছিলো।

তা কিছু হয়েছিলো বই কি। তবে আমাদের শহরের আস্তানা থেকে কিছু সাহায্য আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। মহসীন এমন চুপ রইলো কেন?

উঃ! মাথার যন্ত্রণাটা বড় বেশি মনে হচ্ছে। দেওরাজকে হত্যা করলে এমন অবস্থায় পড়তাম না। নূর তুমি দেওরাজকে হত্যা করতে না দিয়ে ভুল করেছো। কথাগুলো যন্ত্রণাকাতরভাবে বললো মহসীন।

রহমান বললো–সবই তো সেই আল্লাহর ইচ্ছা। মৃত্যু যখন আসবে তখন কেউ তা রোধ করতে পারবে না। দেওরাজের সময় এখনও বাকি রয়েছে।

ততক্ষণে আমার মৃত্যুই বুঝি ঘনিয়ে আসে। হতাশার স্বরে বললো মহসীন।

রহমান বললো–মহসীন, তোমার গলায় এ স্বর মানায় না। এখন ভাবতে হবে কি করে এ স্থান হতে আমরা বের হবো।

নূর নিশ্চুপ শুনছিলো, এবার বললো–আমরা যেমন করে থোক বের হবো এবং আকাশের মুক্ত আলো দেখবো। এসো রহমান চাচা, এসো আমার সঙ্গে। এসো মহসীন চাচা

নূর উঠে দাঁড়ালো এবং গভীর মনোযোগ সহকারে সন্ধান করে ফিরতে লাগলো কোনো পথ আছে কিনা।

রহমান আর মহসীন উঠে পড়লো এবং ভালভাবে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগুতে লাগলো। জমাট অন্ধকার, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, পায়ের শব্দগুলো অশরীরী আত্মার পদধ্বনি বলে মনে হচ্ছে।

নূরের শরীরে অনেক কষাঘাতের চিহ্ন, হাত দুখানা শক্ত করে বাঁধা ছিলো তাই ব্যথায় টট করছে তবুও নূর সাহসে বুক বেঁধে এগুচ্ছে। যেমন করে থোক এখান থেকে তারা বের হবেই।

যতই হাতড়ে হাতড়ে এগুচ্ছে ততই প্রশস্ত মনে হচ্ছে জায়গাটা। আরও কিছুটা এগুতেই কঠিন পাথরে মাথা ঠুকে গেলো নূরের। বুঝতে পারলো এদিকে দেয়ালটা নীচু। বললো নূর–রহমান চাচা, সাবধানে এগুবে। দেয়াল বা ছাদ বড় নিচে নেমে এসেছে, মাথা ঠুকে যাবে।

রহমান বললো–আমার মাথা শক্ত আছে। মহসীন তোমার মাথায় আঘাত পেয়েছে, তুমি খুব সাবধানে এগুবে। ছাদের পাথরে ধাক্কা খেলে ভীষণ কষ্ট পাবে।

মহসীন বললো–যে অন্ধকার তাতে উপায় কি রহমান ভাই। যা হোক তবুও তো চলতে পারছি।

নূর বললো–রহমান চাচা, এটা দেওরাজের অন্ধকার কারাগুহা এর কোনো পথ নেই। এখানে যাদের বন্দী করে রাখা হয় তারা মৃত্যুর পর মুক্তি পায়।

হ্যাঁ ঠিক বলেছো নূর, যেমন দুর্গম অন্ধকার তেমনি ভয়ংকর ঠান্ডা। হয় তো বা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে জমে বরফ হয়ে যাবো।

সত্যি তাই। মহসীন বললো।

গুহাটির মধ্যে অনেকগুলো পথ বা সুরঙ্গ আছে যা আন্দাজ করা যায়। জায়গাটা মাটির তলায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অনেকটা সময় কেটে গেলো।

হাতড়ে হাতড়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করলো তারা। তবুও কোন পথ তারা বের করতে পারলো না। আবার বসলো ওরা পাশাপাশি।

নূর বললো–রহমান চাচা, তোমরা আমাকে রক্ষা করতে এসে নিজেরাই ফাঁদে পড়লে। জানিনা আমরা উদ্ধার পাবো কিনা।

মহসীন, তুমি কেমন বোধ করছো? বললো রহমান।

অনেকটা শক্ত গলায় জবাব এলো-ব্যথাটা কম মনে হচ্ছে।

যাক বাঁচালে মহসীন চাচা। বললো নূর। ক্ষুধার জ্বালা বড় কষ্ট দিচ্ছে রহমান চাচা।

রহমান বললো–তোমাকে ওরা তুলে নিয়ে আসার পর বুঝি কিছু খেতে দেয়নি?

এতখানি কর্তব্যবোধ ওদের হয়নি। ওরা বন্দী করে কষ্ট দেবে এতেই তো ওদের সার্থকতা। চাচা, এবার নিয়ে কয়েকবার আমি শত্রুকবলে বন্দী হলাম, কারণ আমার সরলতা। আমি খুব বিশ্বাস করেছিলাম আমার বাংলোর হাশেম আলী বাবুর্চিটিকে। বেটা বড় সৎ এটাই মনে করতাম আর সেজন্যই আমি এমন বিপদে পড়েছি। আমার মা ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন-ছেলেটা

বড় ভাল, বিশ্বাসী, ওকে তোর রান্না-বান্নার দায়িত্ব বুঝে দিলাম। রহমান চাচা, মায়ের কথায় রাজি হয়ে গেলাম আর বিশ্বাস করে নিয়োগ করলাম আমার রান্নাবান্নার কাজে।

এ সব কি বলছো নূর?

হ্যাঁ রহমান চাচা, মা ওকে নিজের হাতে রান্নাবান্না শিখিয়ে পাকা করে তুলেছিলেন। সত্যি ছোঁড়া আমার মার মতই রাঁধতে পারে তাই....

এ কথা তো কোনো দিন বোনি নূর।

না, কাউকে বলিনি, এমন কি আমার মাও জানে নাসেই আমাকে প্রথম বার খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলো। ছোকরা পয়সার লোভে এ কাজ করেছিলো, আর সে কারণে আমি তাকে প্রচুর পয়সা দিয়েছিলাম আর যেন সে এমন কাজ না করে। মা ব্যথা পাবে ওকে তাড়িয়ে দিলে তাই তাড়িয়ে দেই নি। ক্ষমা করেছিলাম-কিন্তু

তুমি ভুল করেছো নূর, তোমার মাকে সব কথা বলা উচিত ছিলো। তা ছাড়া এমন বাবুর্চি তোমার পাক করবে তা হয় না।

বুঝি, তবুও ক্ষমা করেছিলাম। এবার ওকে আমি ব্যবহার করবো অন্য কাজে। যা আমার কাজে লাগবে।

তা হয় না নূর, ওকে তুমি আর ক্ষমা করতে পারো না। তুমি বড় ছেলেমানুষ তাই বারবার এমন ভুল করছে।

রহমানের কথা শেষ হয় না, একটা শব্দ শোনা যায়। জল প্রপাতের শব্দ। হু হু করে জলরাশি সেই গুহায় প্রবেশ করছে বলে মনে হলো।

নূর বললো–রহমান চাচা, মহসীন চাচা, তোমরা যে শব্দ শুনতে পাচ্ছো তা জলরাশির শব্দ! দেওরাজ কম বুদ্ধির লোক নয়। সে আমাদের হত্যা করার জন্য এই সুরঙ্গমধ্যে জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে-এক্ষুণি আমরা দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। নিকটেই আছে আকসা নদ, এই সুরঙ্গে ঐ হ্রদ থেকে জলরাশি

কথা শেষ হয় না রহমানের, প্রচন্ড জলরাশি প্রবেশ করে। নূর এবং রহমান দ্রুত উঁচু একটি পাথর খন্ডে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো। মহসীনের কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

অন্ধকারে কিছু নজরে পড়ছে না।

শুধু জলোচ্ছাসের প্রচন্ড শব্দ।

নূর রহমানকে শক্ত করে ধরে রাখলো, কারণ তার একটি হাত নেই এ জন্য সে ভয় পাচ্ছিলো যদি সে হঠাৎ জলোচ্ছাসে ভেসে যায়। কিন্তু মহসীন চাচা কোথায়, তার কোনো সাড়া শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবে কি সে জলোচ্ছাসে তলিয়ে গেছে।

বললো নূর–রহমান চাচা, মহসীন চাচার কোনো সাড়া পাচ্ছি না কেন?

রহমান বললো–বুঝতে পারছি না নূর সে আছে না ভেসে গেছে। বেচারার জানি না কি হলো। সাবধান নূর, পা হড়কে গেলে আমরাও তলিয়ে যাবো। জলোচ্ছাসের বেগ কমে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ রহমান চাচা, তাই মনে হচ্ছে। দেওরাজ মস্ত চাল চেলেছে। সে তার মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করে জলোচ্ছাসের প্রচন্ড শক্তি দিয়ে আমাদের হত্যা করতে চেয়েছে। সে জানে আমাদের মৃত্যু হয়েছে।

ঠিক তাই ভাবছে দেওরাজ। ওকে জীবিত রাখা ঠিক হয়নি নূর। বড় শয়তান দেওরাজ।

চাচা, এবার পানির প্রচন্ডতা একেবারে কমে এসেছে। নিশ্চয় এই জলোচ্ছাস এমন কোন পথে বেরিয়ে গেলো যে পথ আমাদের এখান থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে বলে আশা করছি।

অবশ্যই তোমার কথা সত্য নূর। চলো আমরা ওদিকে এগুতে থাকি। এখন পানির বেগ সম্পূর্ণ কমে এসেছে.....

অত্যন্ত সাবধানে চলতে হবে। জানিনা মহসীন চাচার অবস্থা কি হয়েছে।

নূর আর রহমান অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগুতে লাগলো। তখনও হাটু পর্যন্ত পানি কল কল করে এগিয়ে যাচ্ছে। সোতের বেগ যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো সেদিকে এগুতে লাগলো ওরা।

জমাট অন্ধকারে বারবার পড়ে যাবার যোগাড় তবুও সামলে চলছিলো। নূর রহমানের হাতখানা মাঝে মাঝে ধরে তাকে সাহায্য করছে। হঠাৎ মাথা ঠুকে যেতে পারে তাই সাবধানে চলতে হচ্ছে তাদের। দুর্গম অন্ধকার গুহা। পায়ের নিচে জলোচ্ছাস, উপরে জমাট পাথর। অলিগলির মত আঁকাবাঁকা অসমতল পৃথ। তবুও চলছে ওরা। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর অন্ধকার হালকা মনে হলো। একটা আলোর ছটা প্রবেশ করছে সেই অন্ধকারময় গহবরে।

রহমান বললো–নূর, আমরা মুক্ত আলোর কাছাকাছি এসে পড়েছি। আল্লাহ আমাদের সহায়।

নুর বললো–সত্যি চাচা, এমন করে বাঁচার ভরসা পাবো ভাবতে পারিনি। আল্লাহ আমাদের সহায় ছিলেন তাই এমন বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পেলাম।

রহমান চলতে চলতে বললো–তোমার মার দোয়া–

হ্যাঁ চাচা, মা আমার জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছেন। মায়ের দোয়াই আমার চলার পথে পাথেয়।

অনেকটা এগিয়ে এসেছে ওরা।

হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দ কানে ভেসে এলো রহমান ও নূরের। ওরা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো। এখন বেশ আলো আসছে। দেখতে পাচ্ছে ওরা।

যদিও খুব সচ্ছ আলোর ছটা নয় তবুও তারা দেখলে অদূরে কাদার মধ্যে উবু হয়ে পড়ে আছে মহসীন। নূর বলে উঠলো–রহমান চাচা, মহসীন চাচাকে পেয়েছি- নূর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তুলে ধরলো।

ততক্ষণে রহমানও এসে মহসীনকে তুলে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। জলস্রোতে তাকে ভাসিয়ে এনেছিলো এবং জলোচ্ছাসে তার সমস্ত দেহ ভিজে চুপসে গেছে। মাথার ক্ষত দিয়ে তখনও রক্ত গড়াচ্ছিলো। মহসীনকে কাঁধে তুলে নিলো, কারণ তার জ্ঞান ছিলো বলে মনে হলো।

রহমান বললো–তোমার কষ্ট হবে ছোট বাবু। আমার কাঁধে দাও। রহমান মাঝে মাঝে নূরকে ছোট বাবু বলতো আদর করে।

নূর বললো–আমার চেয়ে তোমার কষ্ট বেশি হবে রহমান চাচা, তুমি বরং সাবধানে এগোও।

নূর মহসীনকে কাঁধে নিয়ে পা বাড়ালো।

রহমানও তাকে ধরলো, তারপর এগুতে লাগলো।

অতিকষ্টে তারা অনেক দূর এগিয়ে এলো। এবার দেখলো একটি চ্যাপটা সুরঙ্গমুখ। সেই মুখ দিয়ে জলোচ্ছাস হু হু শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর ওই পথেই কিঞ্চিৎ আলোর ছটা প্রবেশ করছে সেই দুর্গম গুহায়। নূর আর রহমান সেই চ্যাপটা সুরঙ্গ মুখে এসে দাঁড়ালো। জায়গাটা ঢালু আর পিচ্ছিল।

অনেক কষ্টে মহসীনকে কাঁধে করে সুরঙ্গমুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো রহমান আর নূর বাইরে। উবু হয়ে বেরুতে হলো কারণ একটি মানুষ দাঁড়িয়ে চলতে পারবে, তাই কতকটা হামাগুড়ির মত করে বের হলো।

বাইরে প্রশস্ত জায়গা তবে ঢালু। যে কোন মুহূর্তে পা পিছলে গেলে একেবারে গড়িয়ে যাবে তাদের দেহটা নিচে বহুদূরে। হয়তো বা খাদ রয়েছে যে খাদের মধ্যে পড়লে আর ফিরে আসতে পারবে না কোনদিন।

রহমান আর নূর মহসীনের সংজ্ঞাহীন দেহটা বয়ে নিয়ে চললো, একটু সমতল জায়গা। পেলে ওরা সেখানে বসে একটু জিরিয়ে নেবে। ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে তারা।

চলছে অতি সাবধানে, পা টিপে টিপে। একটু এদিক ওদিক হলে সরে পড়বে।

*

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো।

বহুদূর তারা আসতে পেরেছে। মাঝে মধ্যে পাহাড় ও ছোটবড় বনজঙ্গল। এখন আর পা হড়কে যাবার ভয় নেই। সমতল ভূমি, কোথাও ছোটবড় জলধারা বা

ঝরনা। পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। একটা শান্ত ঝরনার ধারে বসে ওরা বিশ্রাম করে নিয়েছে। মহসীন এখন অনেকটা ভাল। তার মাথার ক্ষত দিয়ে আর রক্ত ধারা প্রবাহিত হচ্ছে না।

ওরা বারনার সচ্ছ পানি প্রাণভরে পান করেছে। এখন তাদের পিপাসা নেই তবে ক্ষুধার জ্বালা বেশ কষ্ট দিচ্ছে। রহমান বললো, নূর, আর এগুনো ঠিক হবে না। আমরা এখানে রাত কাটাবো।

আমারও তাই মনে হচ্ছে জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। চার পাশে ছোট-বড় পাহাড়, মাঝে সমতলভূমি। এখানে আমরা সচ্ছন্দে রাত কাটাবো। তাছাড়া রাতের অন্ধকারে পথচলা সম্ভব হবে না, কারণ নানা বিপদের ভয় আছে। নর-শয়তান দেওরাজ ভেবেছে আমরা মরে গেছি-শুধু তাই নয়, তার কু'অভিসন্ধি পূর্ণ চেষ্টা জলোচ্ছ্বাস আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, নূর, দেরাজ মনে করেছে আমরা আর বেঁচে নেই। আমাদের মৃত্যু ঘটেছে।

উঃ! কি সাংঘাতিক শয়তান ঐ দেওরাজ। ওকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। মহসীন কথাগুলো বলে বসে পড়লো।

নূর এবং রহমান পাশাপাশি বসলো।

মহসীন বললো–ভাগ্যে এতছিলো।

নূর বললো–মহসীন চাচা, জীবনে বেঁচে আছো এটাই বড় মনে করবে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করো সেই ভীষণ ভয়ংকর জলপ্রপাতের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।

হ্যাঁ, একথা সত্যি, এমন ভয়ংকর জলোচ্ছাস এর পূর্বে দেখিনি। উঃ কি বাঁচাটাই না বেঁচে গেছি। আমি তো ভেসেই গিয়েছিলাম, ভাগ্যিস একটা ফাটলের সঙ্গে আমার দেহটা আটকে পড়ছিলো, তাই রক্ষে। কথাগুলো বললো মহসীন।

একমুহূর্তে তারা কতটুকু নিশ্চিন্ত।

আশেপাশে তেমন জঙ্গল না থাকায় হিংস্র জীবজন্তুর বিশেষ কোনো আশংকা ছিলো না।

বড় ক্লান্ত অবসন্ন, তাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো নূর আর মহসীন।

রহমান দক্ষ অভিজ্ঞ, সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারলো না। বসে বসে প্রহর গুণতে লাগলো।

ভাবছে রহমান, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার চলতে হবে কিন্তু কোন পথে যাবে তারা কোথায় যাবে। এখন তারা কোথায়, এটা কোন্ স্থান তারা জানে না। নূর ছেলেমানুষ, মহসীন অসুস্থ, তাকেই ভাবতে হবে কেমন করে তারা ফিরে যেতে পারবে। তাদের শরীরের যে অবস্থা তাতে তারা পথ চলতে পারবে তো?

হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রহমান। ক্লান্ত দু'চোখে নিদ্রা জড়িয়ে আসে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা বিকট শব্দে জেগে ওঠে ওরা তিনজন। চোখ মেলেই অবাক হলো, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নিকটেই কোথাও বাজ পড়লো। সেই বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে ওদের।

রাত ভোর হয়ে এসেছে কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চারদিক অন্ধকার মনে হচ্ছে। এখনি বৃষ্টি নামবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রহমান বললো–এখন ভিজতে হবে সবাইকে। আশেপাশে তেমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি।

নূর বললো–তবু বসে বসে ভেজা যাবে না রহমান চাচা। মহসীন চাচা, উঠে পড়ো চলতে থাকি।

মহসীন বললো–তাই চলো নূর। ঠায় বসে বসে ভিজতে আরও বেশি কষ্ট হবে।

মহসীন, রহমান ও নূর উঠে পড়লো।

কিছুটা পথ এগুতে না এগুতেই পুনরায় বজ্রপাত হলো, কানে তালা লাগার জোগাড়। মাথার উপরে জমাটা কালো মেঘ। বিদ্যুতের আলোতে পথ চলছে ওরা।

তারপর শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি।

রহমান বললো–ছোটবাবু, তোমার জন্য ভাবনা। ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়বে।

বললো নূর–আমার চেয়ে তোমাদের বয়স বেশি। অসুখতো তোমাদের হবে রহমান চাচা।

নূরের কথায় হাসলো রহমান-এই বয়সেও তোমাদের মত তরুণদের চেয়ে অনেক কঠিন শক্ত আছি.....

চাচা, বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ছে। মুশকিল হলো দেখছি। মহসীন চাচা খুব কষ্ট হচ্ছে হোমার।

হলেও উপায় কি বলো ছোট বাবু। কষ্ট জড়িত কণ্ঠে বললো মহসীন।

নূরের দুঃখ হলো, বললো নূর–মহসীন চাচা, আমার জন্যই তোমাদের এতো কষ্ট।

ছিঃ ছোটবাবু, তুমি ও কথা বলল না। সর্দারের ছেলে তুমি, আর আমরা তোমার জন্য জীবন দিতে পারবো না। সব পারবো নূর.....

চলতে চলতে কথা বলছিলো ওরা।

অনেকদূর এগিয়ে এসেছে ওরা।

হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে তারা দেখতে পেলো একটি কুঁড়েঘর। ঘরটা জঙ্গলের কাছাকাছি প্রায়।

রহমান বলে উঠলো–ছোট বাবু, ঐ দেখ একটা কুঁড়েঘর। ঐ ঘরে আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।

মহসীন আর নূরও আস্বস্ত হলো এই ভীষণ পানির ঝাপটা থেকে কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাওয়া যায় কিনা।

নূর বললো–রহমান চাচা, তাই চলোর জোরে পা চালাও।

ওরা প্রায় একরকম ছুটেই চললো ঐ কুড়েঘরটার দিকে।

নিকটে পৌঁছতেই এক বৃদ্ধ লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এলো কুঁড়েঘরের দরজা খুলে। মেঘ আর বৃষ্টির বেগে বেশ অন্ধকার হয়েও এসেছে তাই বৃদ্ধ লণ্ঠন হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখমন্ডল বৃদ্ধের।

লণ্ঠন উঁচু করে ধরে বললো–তোমরা কারা? এসো উঠে এসো ভিতরে।

রহমান, নূর আর মহসীন ভাবতেও পারেনি এমন এক স্থানে এমনি একটি আশ্রয় পাবে।

বৃদ্ধ ওদের শুকনা কাপড় দিলো। তাই পড়লো ওরা।

কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলো একপাশে আগুন জ্বলছে। উনুনে রান্না হচ্ছে কিছু। বৃদ্ধ বললো–শুনছো বেগম, আমাদের তিন জন মেহমান এসেছে। তুমি যে খিচুড়ী রান্না করছো তা সবার মিলে হবে তো?

ক্ষুধার জ্বালায় ওদের তিনজনের পেট জ্বালা করছিলো। বৃদ্ধের মুখে খিচুড়ি শব্দ তাদের কানে একটা তৃপ্ত ভাব এনে দিলো। ওরা লক্ষ করলো একটি বৃদ্ধা উনুনের পাশে বসে খিচুড়ি নাড়ছিলো, ফিরে তাকিয়ে বললো–আল্লাহ বরকত দেবেন, তিনজন অতিথিই খাবে আমাদের সঙ্গে।

আঃ! কি আনন্দ! রহমান বলেই ফেললো কথাটা।

অনেকক্ষণ ভিজে ভিজে পা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে উঠেছিলো।

বৃদ্ধের দেওয়া শুকনো কাপড় পরে বেশ আরাম বোধ করছিলো ওরা। কুটিরের মধ্যে অনেকটা গরম, আগুনের তাপে গোটা কুঁড়ে ঘরখানা বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধার খিচুড়ি রান্না হয়ে গেলো।

মেঝেতে খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে তারপর বৃদ্ধা পাঁচখানা থালায় খিচুড়ি বেড়ে খেতে ডাকলো।

বৃদ্ধ এতোক্ষণ হেসে হেসে তাদের কথাবার্তা শুনছিলো এবার বৃদ্ধার আহবানে বললো–চলো অতিথিগণ, আমার বেগম ডাকছে।

রহমান, নূর এবং মহসীন এসে খেতে বসলো।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাও তাদের আসন গ্রহণ করলো।

রহমান নূর ও মহসীনের চক্ষুবিস্ময়ে স্থির হলো, নির্জন বনাঞ্চলের পাশে একটি কুঁড়েঘরে এমন থালা গ্লাস এবং এমন চামচ আশ্চর্য বটে। সব সোনার তৈরি, সচ্ছ পরিষ্কার পানিপূর্ণ গ্লাস যেন তাদের মন কেড়ে নিচ্ছে।

রহমান নূর ও মহসীনকে কিছু ভাবতে দেখে বৃদ্ধ পূর্বের মত দীপ্ত মুখে, বললো–খুব অবাক হয়েছে তোমরা? তাই না, ভাবছো এমন একটি জায়গায় একটি ছোট কুঁড়েঘরে এমন থালা বাসন এবং এমন ধরনের খাবার কি করে সম্ভব হলো।

বললো নূর, হ্যাঁ সত্য বড় অবাক লাগছে আমাদের।

বৃদ্ধ বললো–তোমরা বড় ক্ষুধার্ত, আগে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নাও, তারপর সব বলবো।

রহমান ভাবছে খাবারে কোনো ওষুধ মেশানো হয়নি তো? এটাও কি নরপশু দেওরাজের এক নতুন ফন্দি? না সত্যি বৃদ্ধ সৎ মহৎপ্রাণ লোক.....

বৃদ্ধ হেসে বললো–কিছু ভেবো না তোমরা। আমি সত্যিই সৎ মহৎ ব্যক্তি। আমি তোমাদের শত্রু নই। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারো। বেগম তুমিও খাও, এরা তোমার সন্তানের মত।

বৃদ্ধা বললো–তোমরা খাও, আমি মায়ের মত যত্ন সহকারে পরিবেশন করবো। তাতে আমার তৃপ্তি হবে।

বেশ, তাই যদি মনে করো তবে তাই হোক। বৃদ্ধ কথাটা বলে খেতে শুরু করলো।

রহমান আরও অবাক হলো, সে যে কথা মনে মনে ভাবছে কি করে সেই কথা বুঝতে পারলো বৃদ্ধ। আশ্চর্য বটে.....আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না, কারণ সে এখন যা ভাবছে তাও ঠিক বুঝতে পারছে বৃদ্ধ।

রহমান বললো–ছোট বাবু খেয়ে নাও। মহসীন তোমার বেশি ক্ষুধা পেয়েছে, আর দেরী করো না।

নূর একবার রহমান ও মহসীনের মুখের দিকে তাকিয়ে খেতে শুরু করলো রহমানও মহসীন ততক্ষণে খেতে শুরু করছে।

এমন সুন্দর সুস্বাদু খিচুড়ি ইতিপূর্বে তারা কোনোদিন খায়নি। খেলো ওরা। তপ্ত আনন্দিত হলো খিচুড়ি খেয়ে অবাকও হলো, কারণ বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা মিলে খাবার জন্য রান্না করা খিচুরী পাঁচ জনের হয়ে গেলো।

ওদিকে বৃষ্টি থেমে গেছে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

কুটিরের চাল বেয়ে টুপটাপ করে বৃষ্টির জমে থাকা পানি ঝরে পড়ছে।

খাবার খেয়ে নূর, রহমান ও মহসীন খুশি হয়েছে, তারা ক্ষুধা পিপাসায় বড় কাতর ছিলো, এক্ষণে তৃপ্ত।

নূর বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বললো–বুড়ো বাবা, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো বৃদ্ধ এবং বললো–তোমরা বড় বুদ্ধিহীন, তাই ক্ষমা করলাম।

অবাক বিস্ময়ে নূর, রহমান এবং মহসীন তাকালো বৃদ্ধের মুখের দিকে। হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত লোকটা হঠাৎ এমন হলো কেন। নূর তত বেশি কিছু বলেনি শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

বললো বৃদ্ধ–তোমাদের জন্য আমরা কিছু করিনি, সবই করেছেন পরওয়ার দেগার। তোমরা তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাও, আমাকে নয়।

এতক্ষণে নূর। রহমান ও মহসীন বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কি, হঠাৎ এমন রেগে যাওয়ার কারণ কি হতে পারে বৃদ্ধ যা বললো তা খটি সত্য। একমাত্র তিনিই রক্ষাকারী, নইলে এমন মৃত্যুর মুখ থেকে কেউ বাঁচতে পারে। বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হলো নুরের।

বৃদ্ধ বললো–বৎস, তোমরা জানো আমি তোমাদের খেতে দিলাম তা নয়, সেই মহান আল্লাহ তালার নির্দেশে সব প্রতিপালিত হচ্ছে। তারই মেহেরবানিতে তোমাদের ক্ষুধা নিবারণ হলো। জেনে রাখো, কেউ কোনোদিন কিছু করতে পারে না যতক্ষণ না তিনি নির্দেশ দেন।

নূর, রহমান ও মহসীন অবাক হয়ে শুনছিলো।

বৃদ্ধ ভালভাবে বসলো এবং ওদের বসতে বললো।

খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে বসলো সবাই। একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ। বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো থেকে পানির বিন্দুগুলো ঝরে পড়ছে, তারই টুপ টাপ শব্দ হচ্ছিলো।

বৃদ্ধ বললো–আমি গরিব নিঃস্ব একজন মানুষ। আল্লাহতালার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, আমি তাদেরই একজন। এ পৃথিবীতে যা কিছু তোমরা দেখছো সবই এই মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাই আমার তোমার সবার জন্যই তিনি ভাবছেন। কেমন করে তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ উপকৃত হবে, কি করে তারা পৃথিবীর বুকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারবে সব তার ইচ্ছা। কাজেই কেউ কোনো কিছু করতে পারে না তার বিনা হুকুমে। আমি তারই একজন দাস।

বৃদ্ধ এর বেশি আর কিছু বললো না, সে উঠে দাঁড়ালো এবং স্থির গলায় বললো–এখন তোমরা যেতে পারো। বিপদ কেটে গেছে।

রহমান কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ভেবেছিলো বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানাবে। কিন্তু বৃদ্ধের তেজদীপ্ত মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলার সাহস হলো না।

নূর ও রহমান বৃদ্ধের সাথে করমর্দন করলো।

মহসীন ছালাম জানালো।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বললো–বেগম, ওদের জন্য দোয়া করো।

বেগম মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

নূর ঐ মুহূর্তে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে হতবাক হলো, তারা বৃদ্ধার দিকে এতক্ষণ ভালভাবে তাকিয়ে দেখেনি। বৃদ্ধার মুখমন্ডলে অপূর্ব এক জ্যোতি ছড়িয়ে আছে। আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান রয়েছে। বৃদ্ধার মুখখানা হাস্যোজ্জ্বল।

কুটির থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

বৃদ্ধ আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিলো-ঐ পথ ধরে চলে যাও তোমরা।

রহমান, নূর ও মহসীন তৃপ্ত হৃদয়ে এগিয়ে চললো সেই কুঁড়ে ঘর ছেড়ে। যতদূর দেখা যায় ওরা ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখলো বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে তাদের পথের দিকে তাকিয়ে।

*

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তারা একটি নগরীতে পৌঁছে গেলো।

বিরাট নগর।

নগর ঠিক নয়, রাজ্য বলা চলে।

গাড়িঘোড়া; যানবাহন চলছে। পথে নানা ধরনের লোকজন চলাচল করছে। দোকানপাট, হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্যে সবাই ব্যস্ত।

রহমান, নূর ও মহসীন নগরীর এক সরাইখানায় এসে দাঁড়ালো। ভিতরে প্রবেশ করবে কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো টাকা-পয়সা নেই। সরাইখানায় আশ্রয় নিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন আছে। তারা যে রিক্তহস্ত। রহমানের সঙ্গে কিছু অর্থ ছিলো তা ভেসে গেছে সেই মৃত্যুহার জলোচ্ছ্বাসের অতলে।

রহমান বললো–আমরা আজ না খেলেও ক্ষুধায় কষ্ট পাবো না। তবে রাতের মত আশ্রয় চাই।

নূর বললো–চলো রহমান চাচা ওরা আমাদের অবস্থা দেখলে নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবে।

মহসীন বললো–আমি হাঁটতে পারছি না। বড় ক্লান্ত বোধ করছি।

নূর, রহমান ও মহসীন যখন সরাইখানার পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলো তখন একটি লোক এসে কোমল কণ্ঠে বললো–ভাই, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে চলো। তোমাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমরা বহুদূর থেকে এসেছো এবং নতুন এসেছো এই নগরীতে।

বললো নূর–হ্যাঁ, আপনার কথা সত্য। আমরা বহুদূর হতে আসছি, বড় ক্লান্ত।

রহমান বললো–ভাই দয়া করে রাতের মত যদি আপনাদের সরাইখানায় আশ্রয় দিতেন……

নতুন কথা বলছে। এখানে সবার জন্য দ্বার খোলা। এসো, ভেতরে এসো।

রহমান, মহসীন এবং নূর লোকটার কথা শুনে ভীষণ অবাক হলো। ওকে অনুসরণ করে সরাইখানার ভেতরে প্রবেশ করলো।

সরাইখানার ভেতরে প্রবেশ করতেই দু'জন লোক এগিয়ে এলো, তসলিম জানিয়ে বসলো-এই টেবিলে বসুন। খানা আসছে।

রহমান আর নূর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

মহসীন ততক্ষণে বসে পড়েছে।

ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো সে ভীষণ অসুস্থ বোধ করছে।

যে লোকটি তাদের আহবান জানিয়ে নিয়ে এলো তাকে আর দেখা গেলোনা। সে চলে গেছে সরাইখানার ভেতরে।

রহমান, নূর ও মহসীন আসন গ্রহণ করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে খানা এলো।

রহমান বললো–আমাদের কাছে এক কপর্দকও নেই। পরে কি অবস্থা হবে।

নূর বললো–চাচা, শুরু করো ভাগ্যে যা থাকে হবে।

ওরা সম্মুখস্থ নানাবিধ সুস্বাদু খাবার পরিতৃপ্তি সহকারে খেলো। খাওয়া শেষ হলো কিন্তু সবার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এখন পয়সা চাইলে কি অবস্থা হবে। কোথায় পাবে তারা সরাইখানার মূল্যবান খাদ্যদ্রব্যের মূল্য।

এমন সময় এক বয় এসে বললো–আসুন, আপনাদের বিশ্রামের জন্য কামরা গ্রহণ করুন। আসুন আপনারা…..

লোকটার মিষ্টি কথায় উঠে দাঁড়ালো ওরা তিনজন। চিত্রার্পিতের মত অনুসরণ করলো ওরা। লম্বা টানা বারান্দা, পাশে সারি সারি কামরা। সুন্দর নীলাভ আলো জ্বলছে। ক্ষীণ সুমিষ্ট আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। অপূর্ব এক সমাবেশ।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ওরা এগিয়ে যাচ্ছে।

লোকটা একটি কামরা দেখিয়ে বললো–এটা আপনাদের জন্য যান ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

নূর, রহমান ও মহসীন কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো।

দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে আরও অবাক হলো তারা, সুন্দর পরিচ্ছন্ন কক্ষ। নীল আলো জ্বলছে কক্ষে। তিনটি খাটের উপরে তিনটি শয্যা পাতা রয়েছে। দুগ্ধফেনিল শুভ্র বিছানা, মাঝখানে টেবিল। টেবিলে অজানা ফুলের থোক। সেই ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সারা কক্ষে।

অপূর্ব সে সুবাস।

কক্ষের চারদিকে দেয়ালে স্বর্ণখচিত কারুকার্য।

ওরা শয্যায় বসলো।

নরম তুলতুলে বিছানা।

শয্যায় গা এলিয়ে দিলো ওরা।

ভুলে গেলে তারা সম্বলহীন।

ভোর হলে জেগে উঠলো আজানের ধ্বনির সুমধুর সুরে।

রহমান চাচা শয্যায় নেই তো, কোথায় গেলো সে।

নূর ভাল করে তাকিয়ে দেখলো, রহমান আর মহসীন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছে।

অপূর্ব একটা অনুভূতি খেলে গেলো নূরের মনে।

নূর অজু বানিয়ে রহমান আর মহসীনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো এবং ওদের সঙ্গে নামায আদায় করলো।

নামায শেষ হলে বললো নূর–রহমান চাচা, তুমি নামায পড়ো? মহসীন চাচা, সত্যি তোমরা নামায পড়ো আমি জানতাম না

রহমান তার একটি বাহু দিয়ে মূরকে বেষ্টন করে ধরলো, তারপর ওর ললাটে চুমু দিয়ে বললো–তুমি জানোনা নূর তোমার আব্বুর আদেশ।

রহমান চাচা!

হা নূর, তোমরা কেউ জানোনা যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে বিশ্বজগৎ যখন নিদ্রামগ্ন তখন সর্দার তার জায়নামাযে…

এ কথা সত্যি বলছো?

সত্যি একদিন গভীর রাতে আমি দরবারকক্ষে গিয়েছিলাম কোনো কারণে। দরবারকক্ষে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হলাম। দেখলাম সর্দার তার জমকালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় একটি পাথরখন্ডের উপরে দাঁড়িয়ে একমনে নামায আদায় করছে। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভাবছি সত্য না স্বপ্ন, সর্দারকে কোনো সময় এমন করে একান্ত মনে আল্লাহর আরাধনা করতে দেখিনি। আজ যা দেখছি তা বাস্তব সত্য। অপূর্ব এক অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলাম দরবারকক্ষ হতে। তারপর আমি আমার সমস্ত সহচরদের মধ্যে ঘোষণা করলাম তোমরা এখন থেকে সবাই নামায পড়বে-সর্দারের আদেশ। সত্যি নূর, আমি সেদিন তার কাছে আদেশ পেয়েছিলাম। এর পর আমি আরও অনেক দিন তাকে গভীর রাতে দরবারকক্ষে প্রবেশ করতে দেখেছি, দেখেছি একান্ত মনে তাকে নামায আদায় করতে। একটু থেমে বললো রহমান–সবাই জানে সর্দার নামায পড়ে না বা তার

সময় হয়না কিন্তু আমি জানি তিনি সবার অগোচরে সেই মহান পবিত্রময় পাকপরওয়ার দেগারের নিকট প্রার্থনা করেন।

নূর আবেগভরে বললো–রহমান চাচা, আমরা কেউ জানতাম না। বনহুর, দস্যু বনহুর আল্লাহতালার দরবারে নামায আদায় করেন।

তুমি জানোনা নূর, সর্দার কত পবিত্র, কত মহান ব্যক্তি। তিনি যখন নামায আদায় করেন তখন তাকে অপূর্ব দেখায়। দীপ্তময় সুন্দর এক পুরুষ… রহমানের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে, শ্রদ্ধায় দুচোখ তার জ্বলজ্বল করে ওঠে।

এমন সময় দরজায় কেউ কড়া নাড়লো, ভেতরে আসতে পারি।

রহমান বললো, আসুন।

একজন প্রবেশ করলো, তার হাতে এক বাটি মধু আর চামচ। মধ্যস্থ টেবিলে রেখে বললো লোকটা-আপনারা মধু পান করুন। রাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়নিতো?

রহমান বললো–আমরা কোনো রকম অসুবিধা বোধ করিনি। রাতে ভাল ঘুম হয়েছে।

শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে। কথাটা বলে বেরিয়ে যাচ্ছিলো লোকটা।

নূর বললো–শুনুন।

থমকে দাঁড়ালো লোকটা, ফিরে তাকিয়ে বললো–বলুন, কি বলতে চান?

নূর বললো–আপনারা আমাদের ভালভাবে খানাপিনা খাওয়াচ্ছেন। ভালভাবে খেদমত করছেন। সুন্দর শয্যা দিয়েছেন কিন্তু আমরা আপনাদের সরাইখানার মেহমান হিসাবে আপনাদের জন্য কিছু করতে পারবো না কারণ আমাদের কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই।

লোকটা দূরের কথা যেন বুঝতে পারলো না বলে মনে হলো, সে তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে।

রহমান বললো–আমরা সরাইখানা থেকে বিদায় গ্রহণের সময় আপনাদের খানাপিনার এবং সরাইখানায় অবস্থানের দাম দিতে পারবো না, কারণ আমরা সম্বলহীন এক কপর্দকও নেই আমাদের কাছে।

লোকটা এতক্ষণে যেন অনুধাবন করলে তাদের কথাগুলো, বললো–আপনারা নতুন তাই একথা বলছেন। আমাদের সরাইখানায় যারা আসেন তাদের কোনো টাকা-পয়সা দিতে হয় না। আমাদের তারা মেহমান অতিথি, তাদের সেবাযত্ন করাই আমাদের কাজ।

বললো নূর–আশ্চর্য বটে। যদিও আপনার কথা শুনে আমরা খুশি হলাম কারণ আমাদের অবস্থা এখন শোচনীয়, আমরা নিঃসম্বল।

এখানে যারা আসে তারা সবাই সম্বলহীন। যাদের ধন দৌলত টাকা-পয়সা আছে তারা এখানে আসে না। তাদের জন্য আছে আলাদা সরাইখানা।

নূর অবাক হয়ে বললো–এমন কথা তো শুনিনি। নিঃসম্বল নিঃস্বদের জন্য আলাদা সরাইখানা থাকে। আর সুন্দর মনোরম পরিবেশ....আশ্চর্য বটে।

হ্যাঁ, সব সত্য। এ সব দেখে আপনারা যেমন অবাক হচ্ছেন তেমন আর কেউ হয়না। আমাদের বাদশা হাকিমকে যারা চেনেন না তারা এমন অবাক হন।

কথাগুলো আরও জটিল মনে হলো। বাদশা হাকিমকে তাকে আমরা চিনিনা....কে তিনি বাদশা হাকিম যার সঙ্গে এই সরাইখানার সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। মহসীন এবার বললো ভাই তোমাদের বাদশা হাকিম তিনি কি তোমাদের রাজ্যের বাদশা।

হ্যাঁ, আপনারা মূর্খ তাই তাকে চেনেন না। আমাদের রাজ্যের হাকিম তিনি – তিনি বাদশা। এ সরাইখানা ছাড়া আরও সরাইখানা আছে। হাসপাতাল আছে বিশ্রামাগার আছে, জলাশয় আছে......যার এ সব কথা বলা মানা আছে তবুও আমি বললাম। চলে যাচ্ছিল লোকটি।

নূর বললো শুনুন ভাই আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাই কিছু জানতে চাই। যদি দয়া করে বলেন তাহলে ধন্য হবো।

রহমান বললো–হা, আপনি বলুন আপনাদের বাদশা তিনি সত্য মহান ব্যক্তি। যার এত দয়া, এত দান.....।

না না এ সব বললে বাদশা হাকিম যদি জানতে পারেন তাহলে আমাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করবেন। তার ভীষণ রাগ আছে। এমন কি আমাকে হত্যাও করতে পারেন।

বল ভাই কেন তিনি তোমাকে হত্যাও করতে পারেন? বললো মহসীন।

লোকটা বললো–সব আল্লাহর ইচ্ছা। বাদশা হাকিম তার নাম, তিনি আল্লাহর হুকুম পালন করেন। এই সরাইখানা বাদশা হাকিম বানিয়েছেন। খানাপিনা, আরামখানা, বিশ্রামাগার সব বানিয়েছেন তিনি দুঃখী মানুষের জন্য। যারা সম্বলহীন টাকা-পয়সা যাদের নেই, যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায় তাদের জন্য এই সরাইখানা। যাদের পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খাওয়ার ক্ষমতা নেই তারাই এখানে আসে। যাদের আছে তারা এখানে আসবে না কারণ এ সরাইখানা তাদের জন্য নয়।

বললো নূর–আশ্চর্য বটে। এখানে মানুষগুলোকে তাহলে সত্যিকারের মানুষ বলবো। ভাই কোথায় আপনাদের রাজপ্রাসাদআমরা বাদশা হাকীমের সঙ্গে দেখা করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

লোকটা যেন ভূত দেখার মত শিউরে উঠলো, বললো সর্বনাশ। তাহলে আমার গর্দান যাবে। বাদশা হাকীম কোন প্রশংসা শুনতে চান না। কৃতজ্ঞতা তিনি গ্রহণ করেন না। কারণ সবকিছুই আল্লাহর দান। এ পৃথিবীতে যা কিছু আপনারা দেখছেন সবই তার, সেই পরওয়ারদেগারের। এমন কি আপনাদের দেহ এবং জান সবই......এই মুহূর্তে আপনারা জীবনহীন বন্ধ হয়ে যেতে পারেন, একটা দেহ শুধু পড়ে থাকবে। তারপর মাটিতে মিশে যাবে আপনাদের অস্তিত্ব।

সত্যি, যা বলছেন সত্য। আপনার বাদশা হাকিমকে শুধু একটি বার দেখতে চাই আমরা। কথাটা বললো রহমান।

নূর বললো–হ্যাঁ, ভাই আমরা তাকে একবার দেখতে চাই। যিনি অদ্ভুত মানুষ, আল্লাহর নির্দেশ মত কাজ করে যাচ্ছেন।

হাসলো লোকটা বললো–আপনারা তাকে রাজপ্রাসাদে পাবেন না। তাকে পাবেন জঙ্গলের ধারে এক পর্ণকুটীরে। সেটাই তার রাজ প্রাসাদ।

রহমান, মহসীন আর নূর সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ী করলো। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা সৌম্য সুন্দর শুভ্রদাড়ি, দ্বীপ্ত মুখমন্ডল উজ্জ্বল দুটি চোখ একটি আহ্বান জানালো ভিতরে প্রবেশ করার জন্য। সুন্দর মিষ্টি কথাগুলো। সেই অতি সুস্বাদু খিচুড়ী সব মনে পড়লো তাদের। সেই সৌম্য পুরুষটিই তাহলে বাদশা হাকিম।

নূর বললো–ভাই, আমরা আপনাদের বাদশা হাকিমকে দেখেছি তার আশ্রয়ে একটি দিন কাটাবার সুযোগ আমাদের ভাগ্যে হয়েছে সত্যি বাদশা হাকিম বটে।

মহসীন বলে উঠলো–তোমাদের বাদশা হাকিম থাকেন জঙ্গলের ধারে পর্ণকুটীরে। তিনি রাজ্য শাসন করেন কি ভাবে? একটু বলবে কি?

হ্যাঁ, বলবো। বললো লোকটা।

বলো তাহলে? মহসীন এখন বেশ সুস্থ সবল হয়ে উঠেছে। সে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলছিলো।

রহমান ও নূর প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সেই বিস্ময়কর রাজার কাহিনী শোনার জন্য।

বললো লোকটা–প্রতি শুক্রবার নামাযের পর তিনি পায়ে হেঁটে নগরীতে আসেন। রাজ প্রাসাদের অগণিত প্রজাগণ তার অপেক্ষায় থাকেন। তিনি এসে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন তার শরীরে থাকে রাজকীয় পোশাক। মনি মুক্তা খচিত তাজ তার শিরে শোভা পায়। তিনি সিংহাসনে উপবেশন করার পর বিচার শুরু করেন। তার বিচার সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত কঠিন। তিনি যখন রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন তখন তার চেহারা সাধারণ মানুষের মত থাকে না। তিনি কঠিন কঠোর রূপ ধারণ করেন। বিচারে নিজের ছেলেও পরিত্রাণ পায় না।

আচ্ছা ভাই তাকে আমরা দেখেছি এবং তার সঙ্গে বসে খানাও খেয়েছি। তার সঙ্গে যখন আমরা খাবার খাচ্ছিলাম তখন দেখলাম তার খাবার এবং আমাদের খাবার স্বর্ণ থালায় আর খাবারগুলো পরম সুস্বাদু ছিলো। আমার প্রশ্ন এসব কি তিনি রাজ্য থেকে নিয়ে গেছেন? প্রশ্ন করলো নূর।

লোকটা বললো–না তিনি কোন সময় এ সব রাজ্য বা রাজ কোষ থেকে গ্রহণ করেন না। অন্যান্য দেশের রাজা মহারাজাগণ যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন তাকে তারা। উপঢৌকন স্বরূপ যা প্রদান করেন তা তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। ও সব তারই নিদর্শন।

নূর, রহমান আর মহসীন অবাক হয়ে শুনছিলো লোকটার কথা বার্তা। সব যেন বিস্ময়কর, সেই সৌম্য সুন্দর বৃদ্ধর মুখচ্ছবি ভাসছিলো তাদের মনের পর্দায়। অদ্ভুত বাদশা হাকীম যার কোন তুলনা হয় না অন্যান্য রাজা বাদশার সঙ্গে। নিজে তিনি থাকেন কুঁড়ে ঘরে লোকালয়ের বাইরে। প্রদীপের আলো তার কুটীরের অন্ধকার দূর করে। পাখীর কলরবে তার ঘুম ভাঙে। হরিণ হরিণী তার প্রহরী। গাভী তাকে দুগ্ধ দান করে জোছনার স্নিগ্ধ আলো তার মনে আনন্দ উৎস বয়ে আনে। জায়নামাযে বসে তিনি আরাধনা করেন মহান আল্লাহ তালার। রাজ কোষ মুক্ত নগরীর দুঃস্থ অসহায় মানুষের জন্য এমন রাজা আর এমন রাজ্য তারা কোনদিন দেখেনি। রাজ্যের মানুষগুলোও বড় ঈমানদার সৎ মহৎ যাদের সমর্থ আছে তারা বাদশা হাকিমের ন্যায়বিচার গ্রহণ করবে কিন্তু তার করুণা গ্রহণ করতে রাজি নয়। তারা ভুল করেও লোভের বশিভূত হয়ে এ সব সরাইখানায় আসবে না, তাদের জন্য আছে বিভিন্ন ধরনের সরাইখানা। যে যেমন পয়সা খরচ করতে পারবে তাদের জন্য তেমনি ব্যবস্থা আছে। তারা নিজেদের যোগ্যমত স্থান গ্রহণ করে। কারো প্রতি কোন আক্রমণ বা হিংসা বিদ্বেষ নেই। সবাই চায় সবার মঙ্গল।

রহমান, নূর এবং মহসীন বিদায় গ্রহণ মুহূর্তে তাদের চোখে পানি এসে পড়লো। তাদের জীবনে এমন একটা অভিজ্ঞতা লাভ হলো যা কোন দিন তারা ভাবতে পারেনি। আর একটি বার যদি সেই মহান বাদশা হাকিমের সান্নিধ্য লাভ করতে পারতো তাহলে হৃদয় মন পরিপূর্ণতায় ভরে উঠতো। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রাজা বাস করেন জঙ্গলে, আর সেখানে বসবাস করেও তিনি রাজ্য শাসন করেন কঠোর কঠিন হস্তে, ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রজাদের সুখ সুবিধা দুঃখ-কষ্টকে তিনি নিজের মনে করেন। কিসে তারা সুখে থাকবে, কেমন করে তারা সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারবে তাই তিনি নগরীর বাইরে পর্ণকুটিরে বসে ভাবেন।

বাদশা হাকিমের বিচার যেমন কঠিন কঠোর তেমনি সুন্দর আর মনোরম। রাজ্যের প্রজাদের অভাব তিনি বোঝেন। কি হলে তারা মানুষের মত বাঁচতে

পারবে, আল্লাহ তালার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে নিজকে পৃথিবীর বুকে উপলব্ধি করতে পারবে এই শিক্ষা তিনি দেন তার আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে।

বাদশা হাকিমের কোন অস্ত্রধারী প্রহরী নেই, নেই কোনো যানবাহন। তিনি পায়ে হেঁটে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট সুবিধা-অসুবিধা দেখেন। নগরী ছাড়াও তিনি তার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যান এবং কোন জায়গায় কি প্রয়োজন তিনি দেখেন। এবং যেখানে যে অভাব তিনি তা রাজ ভান্ডার থেকে পূর্ণ করেন।

নানা ধরনের কল কারখানা তিনি রাজকোষ থেকে স্থাপন করেছেন। সেখানে শত শত বেকার তরুণ এবং বেকার ব্যক্তিগণ কাজ করছে উৎপাদন হচ্ছে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যা নিত্য দরকার সবার জন্য। দেশের উৎপাদনীয় দ্রব্যে জনগণের চাহিদা মিটছে, অভাব নেই কোনো। বেকার সমস্যার সমাধান হয়েছে, অগণিত মানুষ সবাই কাজে ব্যস্ত। কেউ তারা অলস নয়, অন্যায় অনাচার তারা বোঝে না। কু-কর্ম তাদের জীবনকে কলুষিত করতে পারে না।

বাদশা হাকিমের রাজ্য পরিচালনায় রাজ্যে সুখের অন্ত নেই। মহসীন, রহমান আর নূর দীপ্ত মন নিয়ে ফিরে এলো কান্দাই নগরীতে।

*

বনহুর চোখ মেললো। সূর্যের আলো তার চোখ দুটোকে ধাধিয়ে দিলো যেন। তবে কি সে বেঁচে আছে। মনে পড়লো সেই প্রচন্ড তান্ডবলীলার কথা। কোথায় রাণী আর কোথায় মাসুমা। ব্যথায় বনহুরের মন টন্ টন্ করে উঠলো। মাসুমার করুণ মুখখানা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। অসহায় মেয়েটির জীবনটা বড় দুঃখের। ফিরে যেতে পারলো না সে তার বাবা-মার কাছে সেই আরাকান শহরে। রাণীরই বা কি অবস্থা হলো……

তাকালো বনহুর সম্মুখে, দু’জন লোক তার পাশে ব্যস্তভাবে কিছু করছে বলে মনে হলো। লোকগুলোর শরীরে বিদেশী বিমান চালকের পোশাক। বনহুর বুঝতে পারলো কোনো উদ্ধারকারী দল তাকে সাগরবক্ষ থেকে উদ্ধার করেছে। ভাল করে তাকাতেই দেখলো পাশেই ছোট্ট একটি বিস্ময়কর বিমান। এমন ধরনের বিমান বনহুর কোথাও দেখেছে বলে মনে হয় না।

বনহুরকে বিমানের পাশে একটি ট্রেচারে শুইয়ে রাখা হয়েছে। বনহুর চোখ মেলে তাকাতেই ওরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাছে এগিয়ে এলো, তাড়াতাড়ি একটা শিশি থেকে কিছু ওষুধ পান করালো, তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলো-কেমন আছো তুমি?

বনহুর জবাব দিলো এখন অনেক ভাল। সম্পূর্ণ সুস্থ বলা যায়। বনহুর উঠে বসার চেষ্টা করলো।

ওদের একজন বললো–এখন উঠোনা, আর কিছুক্ষণ তোমাকে বিশ্রাম করতে হবে। রৌদ্রতাপে তোমার শরীর গরম হোক।

বনহুর হেসে বললো–বন্ধু, আমি এখন মোটেই দুর্বল নই। ধন্যবাদ, তোমরা আমাকে রক্ষা করেছো। শুকরিয়া আল্লাহ তালার কাছে। কিন্তু আমার আর দুজন সঙ্গী ছিলো, তারা কোথায় জানিনা।

বনহুরের কথার মধ্যে একজন বিমানচালক বলে উঠলো–হা, তুমি যা বলছে সত্য আমরা দেখেছি, আর একজনকে আমরা সনাক্ত করতে পেরেছি.......।

আনন্দদ্বীপ্ত কণ্ঠে বললো বনহুর–কোথায় সে? আমি কি তাকে দেখতে পাবো?

আমাদেরই আর একটি উদ্ধারকারী বিমান তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাকে আমরা আরাকানে পাঠিয়েছি। ওয়্যারলেসে সংবাদ পেয়েছি সে এখন হসপিটালে সুস্থ আছে। ওদের একজন বললো।

বনহুর ক্ষণিকের জন্য চমকে উঠলো, আরাকান। মাসুমার বাড়ি ছিলো আরাকানে, তবে কি মাসুমাই জীবনে বেঁচে আছে। সেই তাহলে ভাগ্যক্রমে আরাকানে গিয়ে পৌঁছেছে।

বললো একজন-তোমাদের একজনকে আমরা প্রথমেই উদ্ধার করতে পেরেছি। তোমাকে অনেক পরে। অপরজনকে আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। গভীর পানির নিচে সে তলিয়ে গেছে।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো দুটি মুখ, রাণী আর মাসুমা। সাগর কে কে তলিয়ে গেছে জানে না বনহুর।

ওরা বনহুরকে তাদের উদ্ধারকারী বিমানে তুলে নিলো।

এখন অনেকটা সুস্থ বনহুর।

দু'জন বৈমানিকের সহায়তায় বনহুর নিজের জীবন রক্ষা পেলো তবে আরাকানে ফিরে গিয়ে কাকে দেখবে জানে না সে। একটা বিপুল বাসনা নিয়ে আকাশপথে উড়ে চললো বনহুর।

ঐ স্থান হতে দু'হাজার মাইল দূরে আরাকান।

*

উদ্ধারকারী বিমান এক সময় আরাকানে পৌঁছে গেলো। সমস্ত শহর আলো ঝলমল। বিমান থেকে বনহুর দেখতে পাচ্ছে অসংখ্য আলোর ঝাড়, সারি সারি বিজলীবাতি-লাল, নীল, সবুজ। পথগুলোকে মনে হচ্ছে এক একটি খরস্রোতা নদী, অগণিত যানবাহন আলো ছড়িয়ে ছুটে চলেছে হিংস্র জীবের মত।

বনহুরের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। কোথায় কেমনভাবে সে আরাকানে আসবে জানতো না। সেই মহান আল্লাহ তালার অসীম দয়া তাই সে নানা বিপদ পরিহার করে আরাকানে আসতে পারলো।

মাঝে দুটি বিমান বন্দরে বিমানটি অবতরণ করেছিলো জ্বালানি গ্রহণের জন্য। ইচ্ছা করলে বনহুর প্রথম বিমান বন্দরেই নেমে যেতে পারতো উদ্ধারকারী দলের মতামত নিয়ে। কিন্তু বনহুর তা করলো না, কারণ তারই একজন সঙ্গী আরাকানের এক হসৃপিটালে অবস্থান করছে। বনহুর তাকে না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না। যে হসপিটালে আছে সে কে-রাণী, না মাসুমা?

বিপুল একটা উন্মাদনা নিয়ে বনহুর আরাকান বিমান বন্দরে অবতরণ করলো।

কয়েকটি লোক তাদের বিমানটাকে অভিবাদন জানালো। বনহুর বুঝতে পারলো আরাকানবাসী উদ্ধারকারী বিমানগুলোকে সম্মান দেখায়, কারণ ওরা নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও দশের সেবা করে চলেছে। ওরা মহান ব্যক্তি যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে অহরহ সাগরবুকে সন্ধান করে ঘোরে, পর্বতমালার উপরে, ঘন বন জঙ্গলে সন্ধান করে কে কোথায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারাতে বসেছে। কে

কোথায় শত্রুহস্তে পতিত হয়েছে। কে কোথায় হিংস্র জীবজন্তুর কবলে পড়েছে, এ সব আকাশপথে বাইনোকুলার চোখে দেখা এবং তাদের উদ্ধার করা।

বনহুরকে ওরা একটা গাড়িতে তুলে নিলো।

তারপর আরাকান হসপিটালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। বনহুরকে যখন গাড়িতে তুলে নেওয়া হল তখন বনহুর লক্ষ করলো পাশে আরও একটি বিমান অবতরণ করছে এবং সেই বিমান থেকে কিছু লোক নেমে আসছে বিমানের সিঁড়ি দিয়ে। তাদের মধ্যে একজনকে চেনামুখ বলে মনে হলো বনহুরের কাছে। কিন্তু স্মরণ করতে পারছে না কোথায় দেখছিলো তাকে। লোকটার দৃষ্টি বনহুরের উপরে পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা নিজকে গোপন করার জন্য অন্যান্য যাত্রীর মধ্যে গা ঢাকা দিলো।

ততক্ষণে বনহুরকে হসপিটালের গাড়িতে তুলে নেয়া হয়েছে। গাড়ি আরাকান বিমান বন্দর ত্যাগ করে রাজপথ ধরে চলেছে। ড্রাইভার ছাড়াও তার পাশে উদ্ধারকারীদের একজন ছিলো।

বনহুর ভাবছে সেই লোকটার কথা যাকে যাত্রীবাহী বিমান থেকে নামতে দেখেছিলো বনহুর। কে ঐ ব্যক্তি, কোথায় দেখেছিলো তাকে কিছু স্মরণ হচ্ছে না।

উদ্ধারকারী লোকটা বনহুরের আনমনা ভাব লক্ষ্য করে বললো–কি ভাবছো তুমি? তোমার সঙ্গীদ্বয়ের কথা বুঝি?

উদ্ধারকারীর কথায় বনহুরের চিন্তাধারার মোড় ফিরে গেলো, মুহূর্তে ভুলে গেলো বনহুর ঐ লোকটার কথা। হসপিটালে পৌঁছে বনহুর কাকে দেখতে পাবে রাণী না মাসুমাকে। এলোমেলো নানা চিন্তা তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

শান্ত গলায় বললো বনহুর–হা বন্ধু, ভাবছি আমার দু'জন সঙ্গীর মধ্যে কে জীবিত আছে। কাকে আমি দেখতে পাবো-।

তোমার কথা সত্য। তোমার অবস্থায় পড়লে আমিও এমনি হয়ে পড়তাম। তোমার, ধৈর্য ধারণ করা উচিত কারণ যা হবার তা হয়ে গেছে। তাছাড়া তুমি নিজেও অসুস্থ, বেশি উত্তেজিত হলে তোমার ক্ষতি হতে পারে। তুমি বহুক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলে

বনহুসহ উদ্ধারকারী হসপিটালের সম্মুখে তাদের গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলো।

উদ্ধারকারী বনহুরকে হাত ধরে নামাতে যাচ্ছিলো, বনহুর হেসে বললো–বন্ধু আমি ঠিক আছি। চলো কোন্ দিকে যেতে হবে।

এসো আমার সঙ্গে। উদ্ধারকারী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

এমন হয় না কোনো দিন, বুকটার মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে বনহুর। হসপিটালের বেডে কাকে দেখতে পারে রাণী না মাসুমা। বনহুর উদ্ধারকারীর সঙ্গে ক্যাবিনে প্রবেশ করে দেখলো হসপিটালের বেডে রাণী শুয়ে আছে।

বনহুরকে দেখামাত্র উজ্জ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো–তুমি বেঁচে আছে। মাসুমা....মাসুমা কোথায়?

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো–আমার প্রশ্নও তাই মাসুমা কোথায়?

তুমিও জানো না?

না, যতক্ষণ আমি এখানে এসে না পৌঁছেছিলাম ততক্ষণ ভাবছিলাম হসপিটালের বেড়ে কাকে দেখবো রাণী না মাসুমাকে। জানিনা সে জীবিত আছে না মারা গেছে। যতদূর সম্ভব উদ্ধারকারীদের কথায় জানতে বা বুঝতে পারলাম, মাসুমা সলিল সমাধি লাভ করেছে-বনহুর কথাটা বলতে গিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো।

রাণীর চোখ দুটো ছলছল করছিলো, বললো–আহা বেচারী, আরাকানে আর ফিরে আসতে পারলো না।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রইলো, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছে মাসুমার অস্তিত্বের কথা। তার করুণ কাহিনী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাদের কানের কাছে। সেই অসহায় করুণ দুটি চোখে মায়াভরা চাহনি। আমার বাবা-মার কাছে আর কি ফিরে যেতে পারবো। তারা কি আমাকে গ্রহণ করবে। সমাজ আছে, আমার বাবা মা সমাজ নিয়ে বাস করেন তার সব কথা মনে পড়ছে তাদের।

উদ্ধারকারীর গাড়ি হসপিটালে পৌঁছবার কিছুক্ষণ পর আরও একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো হসপিটালের অদূরে। গাড়ি থেকে নামলো এক ব্যক্তি। তার পরনে ওভার কোট, মাথায় ক্যাপ। ওভার কোটের কলার মুখের অর্ধেক সহ গলাটা বেষ্টন করে রেখেছে। মাথার ক্যাপ দিয়ে সম্পূর্ণ কপালটি ঢাকা। চোখে কালো চশমা।

বনহুর আর রাণীর যখন কথা হচ্ছিলো তখন সেই অপরিচিত লোকটা ভেতরে প্রবেশ করলো এবং আলগোছে রাণীর ক্যাবিনের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি দরজার দিকে পড়তেই লোকটা সরে দাঁড়ালো। বনহুর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো কিন্তু কাউকে দেখা গেলো না।

ফিরে এলো বনহুর রাণীর বেডের পাশে।

চাপাকণ্ঠে বললো রাণী-আমিও দেখছি একটা কালো চশমা পরিহিত দরপ্পার পাশে দাঁড়িয়ে তোমাকে লক্ষ করছিলো।

হ্যাঁ, আমি এ মুখটা বিমান বন্দরে দেখেছি কিন্তু এত লোকটা পোশাক পাল্টালো কি করে। তখন তার শরীরে ছিলো ছাইরঙের ওভার কোট। এখন সম্পূর্ণ বরঙের দেখলাম।

বনহুর সাবধান। শত্রু তোমার পিছু নিয়েছে।

হ্যাঁ, রাণী ঠিক অনুমান করেছে, তাই হবে।

বিলম্ব করোনা বনহুর, কোন হোটেলে উঠে পড়ো। আমি ছাড়া পেলেই দেখা করবো তোমার সঙ্গে। মাসুমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করবো আমরা, কেমন?

বনহুর একবার রাণীর মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

উদ্ধারকারী তাকে ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়েই চলে গিয়েছিলো।

বেরিয়ে এলো বনহুর হসপিটালের বাইরে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে বসলো, তারপর বললো–আরাকানের সবচেয়ে বড় জুয়েলারের দোকানে চলো।

পয়সার প্রয়োজন এখন তার।

আংগুলে পরা আংটির দিকে তাকালো। এ আংটি তাকে মনিরা পরিয়ে দিয়েছিলো। অত্যন্ত মূল্যবান হীরার আংটি।

জুয়েলারের দোকানে ট্যাক্সি রেখে নেমে পড়লো বনহুর।

ভিতরে প্রবেশ মুখে বাধা দিলো দারওয়ান, কারণ বনহুরের পোশাক পরিচ্ছদ তেমন পরিচ্ছন্ন ছিল না। ময়লা এবং ছিঁড়ে গিয়েছিলো স্থানে স্থানে। তাকে একজন সাধারণ ব্যক্তি মনে করেই দারওয়ান পথরোধ করে দাঁড়ালো।

বনহুর হেসে বললো–আমি এই আংটিটি বিক্রি করবো, এ জন্য ভিতরে যাবো। পথ ছেড়ে দাও।

দারওয়ান আংটিটি লক্ষ করে হতভম্ব হলো, একটা সাধারণ লোকের হাতে হীরার আংটি আশ্চর্য বটে। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো দারওয়ান।

বনহুর জুয়েলারের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো।

ট্যাক্সি চালক অপেক্ষা করছিলো তার গাড়িতে বসে। বনহুর বেরিয়ে আসতেই চালক ড্রাইভ আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

বনহুর বসলো গাড়িতে।

ড্রাইভার বললো–কোথায় যাবো স্যার?

তোমার জানা কোনো এক বড় হোটেলে।

আচ্ছা! স্যার।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটি হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থামলো। গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে হোটেলে প্রবেশ করলো বনহুর।

*

বিশ্বাস, তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমার মেয়ে মাসুমা কোথায় জানি না। তুমিই তাকে নিয়ে গিয়েছিলে-ব্যথাকাতর কণ্ঠে কথাগুলো বললো– আরাকানের স্বনামধন্য ব্যক্তি মিঃ মসিয়ুর রিজভী।

মিঃ, এ, কে বিশ্বাস জনাব মসিয়ুর রিজভীর পরম বন্ধু এবং ব্যবসার প্রধান পার্টনার। বহুদিন থেকে তাদের মধ্যে ছিলো পরিচয়, সে পরিচয় একসময় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তারপর আত্মীয়ের অধিকার নিয়ে মিঃ রিজভীর সংসারে জড়িয়ে পড়েন। ব্যবসার খাতিরে মিঃ বিশ্বাসকে মিঃ রিজভীর বাড়িতে আসা যাওয়া করতে হতো আর সে কারণেই গভীরতা বেড়ে যায় উভয়ের মধ্যে।

জনাব মসিয়ুর রিজভীর একমাত্র কন্যা মাসুমা সুন্দরী বটে। তার রূপ লাবন্য মিঃ বিশ্বাসের মনে আগুন জ্বেলে দেয়। মিঃ বিশ্বাস ব্যবসার কারণে এ বাড়িতে আসা যাওয়া করলেও তার কুমতলব ছিলো। মাসুমাকে লক্ষ্য করে তিনি এ বাড়িতে আসতেন এবং মাসুমার সঙ্গলাভের চেষ্টা করতে থাকলেন মিঃ বিশ্বাস।

সরল মন জনাব রিজভী মিঃ বিশ্বাসকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন। স্ত্রী কন্যাকে বিনা দ্বিধায় তার সান্নিধ্যে আসতে দিতেন। তিনি মনে করতেন বিশ্বাস তারই আপন সহৃদয়।

সেই বিশ্বাসকে মিঃ বিশ্বাস বিধ্বস্ত করেছেন। জনাব রিজভীর একমাত্র আদর্শিনী কন্যা মাসুমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে, তারপর তার উপরে চালিয়েছে অকথ্য অত্যাচার। আরাকানে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে এ কারণে তার নিজস্ব জাহাজে তুলে নিয়ে ছিলো মাসুমাকে, এরপর আর মাসুমার সন্ধান মেলেনি।

শয়তান মিঃ বিশ্বাস এসেছেন, যন্ত্রণা দিয়েছেন মিঃ রিজভী ও তার স্ত্রীকে। মিছামিছি চোখের পানি মুছেছেন রুমালে দুঃখ করেছেন মেয়েটা গেলো কোথায়। হয়তো বা কাউকে ভালবাসতো তারই সঙ্গে সে নিখোঁজ হয়েছে। ভালবাসা পাপ নয়, যদি ওরা বিয়ে করে থাকে তবে ভাল। একদিন ওরা ফিরে আসবে। তখন তুমি কন্যা জামাতাকে বরণ করে নিও। ঘাবড়াবার কিছু নেই, মাসুমা জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ভুল করবে না। দেখো একদিন সে ফিরে আসবেই।

বন্ধু মিঃ বিশ্বাসের কথাগুলো জনাব রিজভীর কানে প্রতিধ্বনি তুলেছে কিন্তু অন্তর স্পর্শ করতে পারেনি। বোবার মত শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনেছে, কোনো জবাব দেয়নি।

মাসুমাকে হারিয়ে জনাব রিজভী ও মিসেস রিজভী উম্মাদের মত হয়ে পড়েন। ঐ সুযোগে মিঃ বিশ্বাস ও তার সহকর্মীরা জনাব রিজভীর ব্যবসার সবকিছু হিসাব নিকাশ গরবর করে ফেলেন এবং কৌশলে তার সহি গ্রহণ করে ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন।

এমনি সময় মাসুমাকে হারায় মিঃ বিশ্বাস। তার জাহাজ থেকে কে বা কারা মাসুমাকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে তুলে নিয়ে যায়, তার পর মিঃ বিশ্বাস হন্যে হয়ে সন্ধান করে ফেরে মাসুমার। মিঃ বিশ্বাস সামান্য সময়ের জন্য হলেও বনহুকে দেখেছিলো, তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে যখন লড়াই হয় তখন সেও দুচারটে মুষ্টাঘাত খেয়েছিলো এ কথা মিঃ বিশ্বাস ভোলেনি। মাসুমাকে হারানোর পর মিঃ বিশ্বাস ফিরে এসেছিলো আরাকানে এবং তন্ন তন্ন করে সন্ধান করে ফিরে ছিলো কোথায় আছে মাসুমা।

শেষ পর্যন্ত মাসুমাকে না পেয়ে মিঃ বিশ্বাস ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো এবং তার যত আক্রোশ গিয়ে পড়েছিলো জনাব রিজভীর ওপর। হয়তো তারই চেষ্টায় কোনো উদ্ধারকারীদল মাসুমাকে কৌশলে তার জাহাজ থেকে জোর করে তুলে এনেছে। আর সেই আক্রোশে মিঃ বিশ্বাস একদিন হাজির হলো জনাব রিজভীর বাড়িতে।

প্রথমে জনাব রিজভী বন্ধুবর মিঃ বিশ্বাসকে দেখে খুশি হলেন, একটা আশার আলো উঁকি দিয়েছিলো তার মনে। বলেছিলেন-ভাই আমার মাসুমার কোন খোঁজ পেলেন? বলল, বলে বিশ্বাস, আমার মাসুমা কোথায় বলো?

বিশ্বাসের চোখেমুখে হিংস্র ভাব ফুটে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে-নেকামি করোনা রিজভী, মাসুমা কোথায় তুমি তার জবাব দাও?

মিঃ বিশ্বাসের মুখোভাবে এবং তার কঠিন কণ্ঠস্বরে চমকেই শুধু ওঠেননি জনাব রিজভী, ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কারণ মিঃ বিশ্বাসকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন। মাসুমা শুধু তারই কন্যা নয়, বিশ্বাসেরও বটে। আর সেই মনোভাব নিয়েই

জনাব রিজভী কথাগুলো বলেছিলেন এই মুহূর্তে।

বিশ্বাস এমনভাবে কথা বলবে তা জনাব রিজভী কল্পনাও করতে পারেননি। বলেছিলেন, মাসুমা কোথায় তুমি জানো? বলল জানোনা রিজভী?

হ্যাঁ জানি।

সত্যি বলছো?

তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, মাসুমার সন্ধান পেয়েছি।

বিশ্বাস, আমি জানি তুমিই আমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী আমার এ বিপদ মুহূর্তে তুমি আমার পরম বন্ধু।

জনাব রিজভী দ্রুত তৈরি হয়ে এলেন, বললেন-চলো বিশ্বাস চলো কোথায় তুমি আমার মা-মনির সন্ধানে যাবে। চলো....

মিঃ বিশ্বাস জনাব রিজভীকে তার গাড়িতে তুলে নিলো এবং বেরিয়ে এলো গাড়িখানা তাকে নিয়ে।

তারপর জনাব রিজভী আর ফিরে আসেননি।

তার পুরোনো কর্মচারীগণ জনাব রিজভীর সন্ধান নিতে এসে বিমুখ হয়। তারা কেউ জানেনা বিশ্বাস তাকে কোথায় নিয়ে গেছে। কোথায় কোন্ ঠিকানায় তার সাক্ষাৎ মিলবে কিছুই জানেন না বেগম রিজভী।

দুদিন পর বিশ্বাস এলেন ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, বেগম রিজভী, ভাই বিশ্বাস-আপনার বন্ধু কোথায়? তিনি যে আপনার সঙ্গে গেছেন। বলুন তিনি কোথায়?

জবাবে হেসে বললো বিশ্বাস-রিজভী তো কিছুক্ষণ আগেই ফিরে এসেছে। কেন তিনি বাসায় আসেননি।

না তিনি আসেননি তো।

তবে গেলো কোথায়?

দু’দিন কেটে গেলো। অফিস থেকে লোকজন তার দেখা করতে এসে ফিরে যাচ্ছে অথচ তিনি তো আপনার সঙ্গেই গিয়েছিলেন।

বড় মুশকিল দেখছি। দেখি খোঁজ নিয়ে সন্ধান পাই কিনা। কথাটা বলে মিঃ বিশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো।

একজন বৃদ্ধ নেমে এলেন গাড়ি থেকে এবং তিনি বিনা অনুমতিতে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

বেগম রিজভী জড়োসড়ো হয়ে ভিতরে চলে যাচ্ছিলেন এবং মিঃ বিশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

বৃদ্ধ বললেন-মিঃ রিজভীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি বুঝি মিঃ রিজভীর বন্ধু মিঃ বিশ্বাস?

মিঃ বিশ্বাস ঢোক গিলে চললোহা। আপনার পরিচয়।

বসুন কথা আছে। বেগম রিজভী, আপনিও বসুন। আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী যেমন মিঃ বিশ্বাস আপনাদের মঙ্গল চান আমিও ঠিক তেমনি।

মিঃ বিশ্বাস দাঁড়িয়েই বললো–আপনার পরিচয় জানতে চাই আর যা বলবার থাকে আমাকেই বলুন। বেগম রিজভী পর্দানশীন মহিলা, তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না।

বেশ, তিনি অন্দরমহলে যেতে পারেন। আপনি যান বেগম সাহেবা, আমি মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলে চলে যাবো, মিঃ বিশ্বাস আমি মিঃ রিজভীর পিতার বাল্যবন্ধু। বাস করি গ্রামাঞ্চলে। সংবাদ পেলাম মাসুমা নিখোঁজ হয়েছে?

ভূমিকা রেখে আসল কথা বলুন? বললো মিঃ বিশ্বাস।

বৃদ্ধ সোফায় পা তুলে বসলেন। তিনি যেন নিশ্চিন্ত মনে বসে গল্প করতে এসেছেন। কতকটা আপনভোলা গোছের লোক তিনি, এবার বললেন- ভূমিকা। হ্যাঁ ভূমিকা তো থাকবেই। কথা বলতে গেলে ভূমিকা ছাড়া চলবে কি করে।

বলুন আপনি কি বলতে চান?

রিজভীর মেয়ে মাসুমা কোথায় আছে আমি বলে দিতে পারি।

সত্যি বলছেন? বললো মিঃ বিশ্বাস।

বৃদ্ধ ভালভাবে বসে হাই তুললেন তারপর বললেন-মেয়েটি বড় লক্ষী ছিলো। ছোটবেলায় দেখেছিলাম......

ওসব শুনতে চাইনা, মাসুমা কোথায় তাই বলুন?

সত্যি ওর কথা মনে হলে দু'চোখে পানি এসে যায়। যদি রিজভী বাবাজী থাকতো তা হলে সব বলতাম কিন্তু রিজভী নাকি বাসায় নেই?

হ্যাঁ নেই। কিন্তু কে বললো আপনাকে রিজভী বাসায় নেই?

আপনি আর বেগম সাহেবার কথায় জানতে পারলাম, ঘরে প্রবেশ মুহূর্তে শুনলাম। কোথায় গেছে রিজভী?

এত কথা আপনার জেনে লাভ নেই বুড়োবাবা। বলুন মাসুমা কোথায়?

আমার চেয়ে আপনার বেশি জানা দরকার, কারণ আপনি রিজভীর পরম বন্ধু।

তবে আপনি বললেন-জানেন। বলুন মাসুমা কোথায়?

চুপি চুপি বলছি কাউকে বলবেন না, মাসুমা আমার ওখানে আছে। খবরদার কাউকে বলবেন না। মেয়েটার পেছনে শত্রু লেগেছে

সত্যি বলছেন? আপনার ওখানে আছে সে?

হ্যাঁ সত্যি। সত্যি বলছি......আপনি রিজভীর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলেই তো বললাম। কাউকে যেন বলবেন না, আমি এসেছিলাম রিজভীর কাছে কিছু মোটা টাকা আমার চাই।

টাকা। মোটা টাকা, দেবো আমি দেবো। কত কত চান আপনি?

পরে হবে। আজ নয়, আসবো আর একদিন। কথাটা বলে বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলো।

মিঃ বিশ্বাসের চোখ দুটো শার্দুলের মত জ্বলছে। তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রিজভীর ব্যথাকাতর করুণ কণ্ঠস্বর-বিশ্বাস তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমার মেয়ে মাসুমা কোথায় জানিনা। তুমিই তাকে নিয়ে গিয়েছিলে......

আপন মনে বলে ওঠে বিশ্বাস, রিজভীকে মুক্তি দেওয়া যায় না। সে জানে তার মেয়েকে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম......আমি নিয়ে গিয়েছিলাম......বৃদ্ধার কথা যদি সত্য হয়। মাসুমা যদি বৃদ্ধের নিকটেই থাকে তাহলে তাকে পেতে বিলম্ব হবে না। যত অর্থই লাগুক তা সে দেবে বৃদ্ধকে, তবুও চাই মাসুমাকে। তার পূর্বে রিজভীকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। নইলে বিশ্বাস স্বস্তি পাবে না কোনো সময়।

বিশ্বাস এবার উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

সে হাসির প্রতিধ্বনি বেগম রিজভীর কানে প্রবেশ করলো। তিনি বেরিয়ে এলেন, ললাটে দুশ্চিন্তার ছাপ, চোখ দুটো অশ্রু ছল ছল করছে। অবাক কণ্ঠে বললেন মিসেস রিজভী বৃদ্ধ কি কারণে এসেছিলেন? তিনি কি বললেন যার জন্য হাসছেন আপনি।

ব্যঙ্গ পূর্ব হাসি হেসে বললেন মিঃ বিশ্বাস–বৃদ্ধ নাকি মাসুমার সন্ধান জানেন।

ঠিক বলছেন ভাই বিশ্বাস। আমার মাসুমার সন্ধান তিনি জানেন? কোথায় গেলেন তিনি? কেন তাকে যেতে দিলেন? আমি সব শুনবো, কোথায় আছে আমার নয়নের মনি......কাঁদতে লাগলেন বেগম রিজভী।

মিঃ বিশ্বাস বললো–বৃদ্ধ বড় চতুর। মাসুমার সন্ধান তিনি জানেন কিন্তু কোথায় আছে। কেমন আছে তা বলতে তিনি রাজি নন। মোটা অংকের অর্থ তার চাই, অর্থের বিনিময়ে বৃদ্ধ মাসুমার সন্ধান দেবেন।

কত টাকা তিনি চান। যা চাইবেন তাই দেবো। মিঃ বিশ্বাস আপনি কেন আমাকে ডাকলেন না? আমি তাকে আমার সর্বস্ব দিতাম। সমস্ত ধন-সম্পদ যা তিনি চান সব দিবো। আমার মাসুমাই তো সব, তার জন্য আমি সব কিছু দেবো.......

বেশ, আপনি রাজি আছেন এ কথা আমি তাকে জানাবো। আবার তিনি আসবেন। সেদিন চুক্তিপত্রে সই হবে....কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো মিঃ বিশ্বাস।

*

রিজভী, তুমি মুক্তি চেয়েছিলে-না?

হ্যাঁ বিশ্বাস, যা আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমি জানি না আমার মা কোথায়? আমার মা মাসুমা মনি.......।

মিঃ বিশ্বাস শয়তানি হাসি হেসে বললো–রিজভী, তোমার মা মনির সন্ধান পেয়েছি।

বিশ্বাস, সত্যি বলছো তুমি আমার মা মনির খোঁজ জানতে না? বন্ধু তুমিই তো তাকে কন্যার স্নেহে নিয়ে গিয়েছিলে। সেকথা তুমি স্বীকার না করলেও আমি জানি। আজ তুমি আমাকে বলছো তার সন্ধান পেয়েছে। বিশ্বাস তুমি কি সত্যিই জানতে না?

না। জানলে তোমাকে এই পোড়াবাড়িতে বন্ধ অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখতাম না। তোমাকে তিল তিল করে নির্যাতন করতাম না। রিজভী, যে তোমার মেয়ের সন্ধান দিয়েছে তার দাবি প্রচুর অর্থ......

তাই দেবো। আমি আমার সর্বস্ব দেবো তবু মাসুমাকে আমায় ফিরিয়ে দাও বিশ্বাস। আমি আমার সবকিছু-মিল কল কারখানা, ইন্ডাষ্ট্রি সব লিখে দেব তোমার নামে।

সত্যি বলছে রিজভী?

হ্যাঁ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি।

বেশ তাই হবে। তোমার মাসুমাকে ফিরে পাবে, তবে সব আমার নামে উইল করে দিতে হবে তারপর।

আমি রাজি। যা বলবে বিশ্বাস তাতেই রাজি।

কিন্তু তোমার মুখ কি তখন বন্ধ থাকবে?

কি বলছো ঠিক বুঝতে পারছি না।

যখন মেয়েকে ফিরে পাবে তখন তুমি আবার তোমার ব্যবসা বাণিজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য উম্মাদ হয়ে উঠবে।

না, আমি কিছুই চাবো না বিশ্বাস। আমাকে মুক্তি দাও আর আমার মাসুমাকে ফিরিয়ে দাও। এই অন্ধ ঘরে বদ্ধ আবহাওয়ায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে....

আর দুটি দিন অপেক্ষা করো রিজভী, তুমি মুক্তি পাবে। অনাবিল শান্তি আর বিশ্রাম করবে....হাঃ হাঃ হাঃ অনাবিল শান্তি আর বিশ্রাম।

বিশ্বাস, তুমি অমন করে হাসছো কেন? তোমার কথাগুলো কেমন যেন হেঁয়ালিপূর্ণ লাগছে। তুমি কি বলতে চাও বন্ধু?

সব দুদিন পর শুনবে। আর দুটি দিন তুমি এই অন্ধকার বদ্ধ ঘরে বন্দী থাকবে, তারপর আর কোনো চিন্তা তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে না। আজ চলি রিজভী, দুদিন পর দেখা হবে।

মিঃ রিজভীর মুখ ফ্যাকাশে, তার ললাটে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। একটি কথাও তার মুখ দিয়ে আর বের হলো না। বিশ্বাস বেরিয়ে গেলো।

বিশ্বাসের ইংগিতে দরজা বন্ধ করা হলো, তারপর তালা বদ্ধ হলো। পোড়োবাড়ির অন্ধকার কক্ষে মেঝেতে বসে পড়লো মিঃ রিজভী। তার চোখের সামনে জমাট মৃত্যুভয়াল অন্ধকার।

বিশ্বাস দুদিন পর আসবে। কি সংবাদ যে আনবে কে জানে। সত্যি কি মাসুমার সন্ধান বিশ্বাস পেয়েছে। কিন্তু তার কথাবার্তা অমন হেঁয়ালিপূর্ণ কেন? জনাব রিজভী প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, বিশ্বাস করতেন তার সহকারী পার্টনার বিশ্বাসকে আর সেই বিশ্বাস তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

অনেক কথাই মনে পড়ছে জনাব রিজভীর।

বনহুর তার রুমের শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট পান করছিলো। আরাকানে এই তার প্রথম অবস্থান। যা কিছু তার প্রয়োজন সব কেনাকাটা

হয়েছে। ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে রাখলো তার নতুন ব্যাগে।

হোটেলের নাম লর্ড মার্গারেট হাউস।

কোনো এক সৈনিকের নামে এই হোটেলটির নাম রাখা হয়েছে। এখানে যারা বাস করেন তারা সবাই ধনাঢ্য ব্যক্তি। হোটেলের সম্মুখে মার্বেল পাথরে তৈরি বিরাট এক মূর্তি। সুন্দর-সুপুরুষ এক সৈনিক, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত-পায়ে ভারী বুট, মাথায় ক্যাপ। সবাই হোটেলের সমানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, ভাল করে তাকিয়ে দেখে সত্যি পাথরের মূর্তিটা অপূর্ব বটে।......।

বনহুর শয্যায় শুয়ে ভাবছিলো লর্ড মার্গারেটের কথা। যার নামকরণে এ হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে, নিশ্চয়ই এ দেশের জন্য তার এমন কিছু অবদান আছে যার জন্য দেশবাসী কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারই স্মৃতিরক্ষার্থে এ হোটেল তৈরি করেছে। বনহুর হোটেলে আশ্রয় নেবার পর জানতে পেরেছে এ হোটেলের নামই শুধু লর্ড মার্গারেট রাখা হয়নি, এই হোটেলের যত আয় সবই আরাকানের বেকার যুবকদের শিক্ষাদীক্ষা এবং কর্মসংস্থানের জন্য ব্যয় হয়ে থাকে। লর্ড মার্গারেট চিরকুমার ছিলেন, তার সৈনিক জীবনে যা কিছু তিনি উপার্জন করেছিলেন সবই দেশের জনগণের সেবায় দান করে গেছেন। তিনি সি, এন, সি, পদ লাভ করেছিলেন তবুও একজন সাধারণ সৈনিকের মত নিজকে মনে করতেন। মৃত্যু তার ঘটেছিলো যুদ্ধক্ষেত্রে, মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি তার সঙ্গীকে বলে গিয়েছিলেন, আমার সমস্ত অর্থ ব্যয় হবে দেশের বেকার জনগণের জন্য। বনহুর ভাবছে, হয়তো লর্ড মার্গারেট একদিন নিঃসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন, তার বেকার জীবন কত দুঃখ আর বেদনাদায়ক তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন, আর সেই কারণেই তিনি নিজের সব কিছু দেশের বেকার যুবকদের শিক্ষাদীক্ষা এবং কর্মসংস্থানের জন্য দান করে গেছেন। বনহুরের চোখের সামনে একটি পৌরুষদীপ্ত মুখ ভেসে উঠলো, তা ঐ লর্ড মার্গারেটের মুখ, যা পাথর খুদে তৈরি করা হয়েছে। বনহুর আনমনা হয়ে যায়, তারপর এক সময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় বনহুরের, একটা আতশব্দ ভেসে আসে তার কানে। নারীকণ্ঠের আর্তচীকার।

বনহুর দ্রুত বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে নিয়ে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরে টানা লন, তারপর পাশাপাশি ক্যাবিন। বনহুর লক্ষ করলো, শব্দটা আটাশ নম্বর ক্যাবিন থেকে ভেসে এসেছে। সে দ্রুত সেই ক্যাবিনের দিকে দৌড়ে গেলো। দরজা। খোলা ছিলো, বনহুর প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে। প্রবেশ

করতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। বনহুর দেখলো একটা লোক পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে একটি অর্ধউলঙ্গ নারী। নারীটির দেহ টলছে। লোকটি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকায় তাকে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না তবে তার হাতে রয়েছে একটি সুতীক্ষ্ণধার ছুরি তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বনহুর মেয়েটিকে ধরে শুইয়ে দিলো পাশের শয্যায়।

ততক্ষণে লোকটি ছুটে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

বনহুর মেয়েটিকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো। এবং লোকটা ছুরি হাতে যেদিকে পালাচ্ছিলো সেই দিকে এগিয়ে চললো।

ততক্ষণে হোটেলের দু'চার জন বয় ছুটে এসেছে।

বিপদ সংকেত ঘণ্টাধ্বনি শুরু হলো।

লোকটা হোটেলের বেলকুনি বেয়ে দৌড়াচ্ছে। অত্যন্ত দুর্গম পথ। বনহুরও সেই পথে ছুটলো।

বিপদসংকেত ধ্বনির শব্দ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের সবাই সজাগ হয়ে। উঠলো। একটা আতংক ছড়িয়ে পড়লো ক্যাবিনে ক্যাবিনে। কেউ দরজা খুলে বেরিয়ে আসার সাহস পেলো না।

বনহুর লোকটার পিছু ছুটতে ছুটতে পানির ট্যাংকের কাছে চলে এলো। লোকটা ছুরি ফেলে দিয়ে পানির ট্যাকের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে গেলো। সে মনে করলে তাকে ধাওয়াকারী পানির পাইপ বেয়ে উপরে উঠতে পারবে না। কিন্তু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। সেও পানির পাইপ বেয়ে উপরে উঠে পড়লো।

ততক্ষণে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশ অফিসে ফোন করে দিয়েছিলো, কাজেই পুলিশ ফোর্স এসে পড়লো। তারা সার্চ লাইট ধরলো পানির ট্যাংকের উপরিভাগে।

পুলিশ ফোর্স অবাক হয়ে দেখলো দু'জন লোক পানির ট্যাংকের উপরে ধস্তাধস্তি চলছে। সেকি ভীষণ লড়াই, কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছে না।

সার্চলাইটের আলোতে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বনহুরের পকেটে ছিলো রিভলভার। পানির ট্যাংক বেয়ে যখন বনহুর উপরে উঠে গেলো তখন সে নিজের হস্তস্থিত রিভলভার পকেটে রেখেছিলো। এবার বনহুর সার্চের আলোতে শয়তানটিকে লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করে ধরলো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো–খবরদার, একটুও নড়বে না, যে পথে উপরে উঠেছিলে সেই পথে নেমে যাও।

অগত্যা লোকটা পাইপ বেয়ে নিচে নামতে লাগলো, পুলিশ ফোর্স তাদের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে নিচে দাঁড়িয়ে রইলো।

উপরে বনহুর রিভলভার ধরে রেখেছে আর নিচে পুলিশ ফোর্স অপেক্ষা করছে।

লোকটা নামতে বাধ্য হলো।

সে নামতেই তার চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললো পুলিশ ফোর্স। তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো।

ততক্ষণে বনহুরও নেমে এসেছে।

পুলিশ প্রধান বনহুরের কর মর্দন করে তাকে ধন্যবাদ জানালেন কারণ তারই জন্য পুলিশ ফোর্স খুনীকে ধরতে পারলেন।

ওদিকে হোটেলকক্ষে তরুণী মিস লীলা নাগের লাশ সনাক্ত করা হয়েছে। লীলা নাগ আরাকানের শ্রেষ্ঠ চিত্র অভিনেত্রী। তার কণ্ঠে ছিলো বহুমূল্যবান হীরকখচিত হার।

দুষ্কৃতিকারী হোটেলের ক্যাবিনে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে এবং হীরকখচিত হার ছিঁড়ে নিয়ে পলায়ন করে।

বনহুর তাকে ফলো করে এবং গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

কে ঐ ব্যক্তি যে আরাকানের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মিস লীলা নাগের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করলো। সমস্ত হোটেলে একটা আতঙ্কভাব ছড়িয়ে পড়লো।

যখন লোকটাকে পুলিশ মহল গ্রেপ্তার করে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো তখন তার কাছে পাওয়া গেলো মিস লীলা নাগের কণ্ঠের হীরকখচিত সেই মূল্যবান হার।

এবার পুলিশ ফোর্স লোকটিকে তাদের ভ্যানে তুলে নেবার জন্য অস্ত্র বাগিয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি গুলী এসে বিদ্ধ হলো লোকটার বুকে।

তীব্র আর্তনাদ করে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

আবার একটা ভয়ার্ত গুঞ্জন উঠলো হোটেল লর্ড মার্গারেট হাউসের বুকে। ভীষণ একটা আতঙ্ক জাগলো কারা মিস্ লীলা নাগকে এবং তার খুনীকে হত্যা করলো।

বনহুর বুঝতে পারলে কোনো একটা দল এ কাজ করছে, যারা মিস লীলা নাগকে হত্যা করিয়ে তার কণ্ঠের মূল্যবান হীরকহার আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলো। যখন তারা দেখলো লীলা নাগের হত্যাকারী ধরা পড়ে গেছে, হীরক হার পুলিশ হেফাজতে, তখন সেই দল খতম করে দিলো লোকটিকে। যেন সে পুলিশমহলের কাছে কিছু ফাঁস করতে না পারে।

বনহুরের দৃষ্টি এড়ায় না, সে আবার সেই মুখটা দেখলে যে মুখ সে আরাকান বিমান বন্দরে অবতরণ করার মুহূর্তে দেখেছিলো। সবার অলক্ষ্যে ঐ মুখ সরে গেলো।

বনহুর ফিরে এলো নিজের ক্যাবিনে।

মিস লীলা নাগের ছবিসহ পরদিন তার হত্যারহস্য সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লো। সমস্ত শহরে একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো। আরাকানের শ্রেষ্ঠ চিত্র অভিনেত্রী মিস লীলা নাগ। সুদীর্ঘ সময় সে এই লর্ড মার্গারেট হোটেলে অবস্থান করছিলো। তার রাজপ্রাসাদ সমতুল্য বাসভবনে সে কমই থাকতো। অবশ্য এর কারণ রয়েছে মার্গারেট হোটেলের আয় বাড়ানোই ছিলো তার লক্ষ্য। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা আসতে শুধু লীলা নাগ এ হোটলে থাকার জন্য। তার অগণিত দর্শনপ্রার্থী ভীড় জমাতে মার্গারেট হোটেলে। তারা দিনের পর দিন প্রচুর অর্থব্যয়ে বসবাস করতো, মুহূর্ত তার সাক্ষাৎ লাভের আশায় প্রহর গুণতো।

এসব প্রচুর অর্থব্যয় হতো আরাকানের রিক্ত নিঃস্ব অসহায় বেকার যুবসমাজের কর্মসংস্থানের জন্য। ইন্ডাষ্ট্রি-কলকারখানা তৈরি করা হয়েছে, এসব ইন্ডাষ্ট্রি কলকারখানায় প্রচুর বেকার তাদের অন্ন সংস্থান করে নিচ্ছে। এতে বেকার সমস্যা দূর হচ্ছে এবং দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী সরকার দেশের উৎপাদন বাড়াচ্ছেন, তাতে দুটি উপকার হচ্ছে-একটি হলো বেকার সমস্যা দূরীকরণ, অপরটি দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে ভোলা।

বনহুর আরাকান সরকারের সুবুদ্ধির প্রশংসা করে, যদিও সে এ মুহূর্তে একটি গভীর চিন্তার সম্মুখীন হয়েছে। মিস লীলা নাগ হত্যাকাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো বনহুর। সংবাদিকগণ তার ছবি চিত্র অভিনেত্রী নিহত মিস লীলা নাগের ছবির সঙ্গে প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করলে বনহুর মত দেয়নি। সে চায়না তার ছবি কোনো পত্রিকায় ছাপানো হোক।

সাংবাদিকগণ ভীড় জমিয়েছে, পুলিশ মহল নানাভাবে রিপোর্ট গ্রহণ করছেন। বনহুর হাস্যোজ্জ্বল মুখে সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। কিন্তু সর্বক্ষণ একটি মুখ তার মনে উঁকি দিচ্ছে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি যাকে সে আরাকান বিমান বন্দরে দেখেছিলো।

*

রহমান ও মহসীন নূরকে নিয়ে ফিরে এলো আস্তানায়।

নুর কান্দাই ফিরে যাবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত তবুও রহমান তাকে ইচ্ছা করেই এনেছে আস্তানায়। তার ইচ্ছা জাভেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। একদিন নুর ফুল্লরাকে দেখেছিলো এই বনে। নূর জানতোনা ফুল্লরা তার পিতা বনহুরের আস্তানার মেয়ে।

জাভেদের সঙ্গে তার লড়াই হয়েছে বারকয়েক।

তারও কারণ ছিলো ফুল্লরা।

রহমানের সঙ্গে কান্দাই জঙ্গলে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই নূরের নজরে পড়লো ফুল্লরা। একটি কলসী কাখে ঝরনা থেকে পানি আনছিলো। গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নূর ফুল্লরার দিকে।

ফুল্লরা হরিণীর মত চঞ্চল গতিতে চলে গেলো।

নূর নিশ্চুপ রহমানকে অনুসরণ করলো।

আস্তানায় প্রবেশ করতেই জাভেদ এগিয়ে এলো। হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নূরের দিকে।

রহমান বললো–জাভেদ, এসো তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেই। এসো........

বললো জাভেদ–ওকে আমি চিনি।

বললো রহমান–তা ছাড়া আরও একটি পরিচয় আছে যা তোমরা কেউ জানো না। এসো জাভেদ....

জাভেদ ক্রুদ্ধভাবে চলে যাচ্ছিলো।

নূরী এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো-জাভেদ, তোমার রহমান চাচা যা বলছে শোন। এসো জাভেদ আমার সঙ্গে এসো।

নূরী জাভেদের হাত ধরে টেনে আনলো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো নূর আর রহমান।

জাভেদ গম্ভীর মুখে এসে দাঁড়ালো রহমান আর নূরের সামনে।

রহমান বললো–তোমরা উভয়েই ভাই ভাই। জাভেদ, নূর তোমার সহোদর......

জাভেদ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো মায়ের মুখের দিকে।

নূরী উচ্ছল দীপ্ত কণ্ঠে বললো–হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, নূর তোমার সহোদর। আমার সন্তান সে।

আম্মি!

হা জাভেদ।

নূর মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো জাভেদের দিকে।

জাভেদ হাত বাড়িয়ে দিলো।

নূর ওর হাতে হাত রাখলো, তারপর উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করলো গভীরভাবে।

রহমান হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বললো, মারহাবা! অপূর্ব মিলন, এই মিলন যেন তোমাদের পরিপূর্ণ হয়….

জাভেদ আর নূরের মধ্যে শুধু ভ্রাতৃত্ব ভাবই ফুটে উঠলো না, তাদের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠলো দুদিনের মধ্যে। ওরা দুজন এক সঙ্গে শিকার করে, একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়, একসঙ্গে ঝর্ণার পানিতে দু’ ভাই সাঁতার কাটে।

ফুল্লরা ওদের সঙ্গী।

ওরা যখন শিকারে যায় ফুল্লরা ওদের অশ্ব তৈরি করে লাগাম নিয়ে আসে। ওরা অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে, ফুল্লরা হাত নেড়ে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

এখন ওরা ফুল্লরাকে নিয়ে ঝগড়া-লড়াই করে না। ফুল্লরাকে ওরা দুজনই স্নেহ করে, ভালবাসে। ফুল্লরা নূরকে দেখলে আর ছুটে পালায় না। একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে ওদের তিন জনের মধ্যে।

কয়েক দিনে নূর পালটে গেছে অনেক।

জঙ্গল আর বন্য জীবজন্তু তাদের সঙ্গী।

পাখীর কলরবে ঘুম ভাঙে ওদের। পাখীর গান বড় মধুর লাগে নূরের কাছে। জঙ্গলের জীবজন্তুগুলোকে বড় আপন মনে হয়। ঝরনার পানিতে সাঁতার কাটতে বড় আনন্দ নূরের। ফুল্লরা প্রতিদিন বন্য ফুল দিয়ে দুটো মালা গাঁথে, মালা দুটো সে পরিয়ে দেয় দু’ভাইয়ের গলায়।

নূরী দূর থেকে দেখে, আনন্দে ভরে ওঠে তার মন।

এক সময় বলে নূরী-রহমান ভাই, তুমি বড় বুদ্ধিমান, ওদের দুজনকে তুমি এক সূতায় গেঁথে ফেলেছে। ওদের দেখে মনে হয় ওরা দুটি যেন জোড়া পাখি…..

হাসে রহমান, পূর্ণ তৃপ্তির সে হাসি।

রহমান জয়ী হয়েছে, দুভাইয়ের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছে সে। ফুল্লরা ওদের সঙ্গী, ফুলের মত সুন্দর সে। গোলাপের পাপড়ির মত ওষ্ঠদ্বয়। ডাগর ডাগর দুটি চোখ, ললাট সুন্দর। একরাশ চুল ছড়িয়ে থাকে ওর কাঁধে-পিঠে। হরিণীর মত চঞ্চল, শিশুর মত সরল। ফুল্লরা সারাদিন গোটা বন মুখর করে রাখে, পাহাড়িয়া ঝরণার মত সে।

এদিকে নূর যখন কান্দাই আস্তানায় মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। তখন মনিরা আর মরিয়ম বেগম পাগলিনী প্রায় হয়ে উঠেছে। তারা সমস্ত কান্দাই শহরে সন্ধান চালাচ্ছে কোথায় সে।

পুলিশমহল জোর তদন্ত করেও নূরের কোনো সন্ধান পায় না। কান্দাই পত্রপত্রিকায় নানাভাবে এ সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। কেউ নূরের সন্ধান দিতে পারলে তাকে মোটা অংক অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ঘোষণা সত্ত্বেও কোন হদিস না পেয়ে চৌধুরীবাড়ির সবাই মুষড়ে পড়েছে।

নর শয়তান দেওরাজ কান্দাই ফিরে আসে। পত্রপত্রিকায় সংবাদ পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হয় তার মন। দেওরাজ জানে তরুণ ডিটেকটিভ নূরুজ্জামান আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। তাকে দেওরাজ মৃত্যুগহ্বরে জলোচ্ছাসের অতলে দম বন্ধ করে হত্যা করেছে। এখন তার কাজে বাধা দেয়ার জন্য আর কেউ নেই....তবে বনহুরকে তার ভয়। জানে না সে বনহুর এখন কোথায়।

বেগম রিজভী আমি আপনার নিকটে একবর্ণ মিথ্যা বলছি না। বন্ধুপত্নী বলেই আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করুন। আপনি যা আমার কাছে গচ্ছিত রাখলেন তা আপনার মঙ্গলের জন্য, কারণ আপনার স্বামীর পেছনে শত্রু লেগেছে, এ মুহূর্তে এই মূল্যবান অলঙ্কার......মিঃ বিশ্বাসের কথার মাঝখানে।

*

বেগম রিজভী, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন-আমি জানি আপনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ভরসা। সব থেকেও আজ আমি নিঃস্ব-রিক্ত অসহায়। আপনিই শুধু আমাদের মঙ্গল চান......

হ্যাঁ একথা কোনো সময় ভুলে যাবেন না বেগম রিজভী আর আমি জানি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন এই ভরসা নিয়েই এসেছি। আপনারা বিপদে

পড়ুন এ আমি চাই না। আচ্ছা, আজ এখন চলি। বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।

নির্বাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন বেগম রিজভী। মিঃ বিশ্বাস তার অলংকারের বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মিঃ বিশ্বাস গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই শিখ ড্রাইভার ড্রাইভ আসন থেকে নেমে দরজা খুলে ধরলো।

গাড়ির পেছন আসনে উঠে বসলো মিঃ বিশ্বাস।

গাড়ি উল্কা বেগে ছুটে চললো।

আরাকান রাজপথ বেয়ে চলেছে মিঃ বিশ্বাসের গাড়িখানা। তার সমস্ত মুখ জুড়ে একটা ক্রুর হাসি। শার্দুলের মত চোখ দুটো জ্বলছে।

পথের দু'ধারে বিজুলী বাতিগুলো অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। যানবাহনগুলো চলে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে।

রাত বাড়ছে।

শহর ছেড়ে দূরে, অনেক দূরে গাড়িখানা চলে এলো।

নির্জন পথ।

এ পথে যানবাহন চলাচল কম। অমাবশ্যার অন্ধকার রাত। এদিকে আলোগুলো ঝিমানো গোছের। স্বল্প আলো ছড়াচ্ছে। পথে আবছা আলো। লাইটপোষ্টগুলোর দূরত্ব বেশি।

একটি পোড়োবাড়ির সম্মুখে গাড়ি এসে থামলো।

মিঃ বিশ্বাস নেমে পড়লো।

সেই কক্ষ। যে কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে জনাব রিজভীকে। দরজা তালাবদ্ধ ছিলো।

মিঃ বিশ্বাস তালা খুলে প্রবেশ করলো সেই কক্ষে। কঠিন কণ্ঠে ডাকলো- রিজভী......

এসেছো বন্ধু? এসেছো?

হ্যাঁ। মিঃ বিশ্বাস পকেট থেকে একটি মোমবাতি বের করলো, তারপর ম্যাচ জ্বেলে আলো ধরালো।

রিজভী, তোমার মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। প্রচুর ধনসম্পদের বিনিময়ে। তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য-ইন্ডাষ্ট্রি কলকারখানা সব উইল করে দিতে হবে।

তাই দেবো বন্ধু, তাই দেবো।

তাহলে এই উইলে দস্তখত দাও। মিঃ রিজভীর সামনে মোম বাতির আলোতে খুলে ধরলো একটি উইল। এখানে দস্তখত দাও। সব লেখা আছে, শুধু সই দেবে। একটি কলম মিঃ বিশ্বাস গুঁজে দিলো মিঃ রিজভীর হাতে।

রিজভীর মুখে অসহায়ের করুণ হাসি। তিনি হাত বাড়িয়ে কলম নিলেন এবং দস্তখত করার জন্য কলম ধরলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ বৃদ্ধ প্রবেশ করলো সেই কক্ষে, দাঁড়াও আমি এসেছি। মিঃ বিশ্বাস, আমি বলেছিলাম দুদিন পর আসছি।

চমকে ফিরে তাকালো মিঃ বিশ্বাস–বুড়ো বাবা আপনি।

হ্যাঁ আমি।

এখানে কি করে এলেন?

তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ।

আমি।

হ্যাঁ। ঐ উইল হবে আমার নামে, কারণ মাসুমার সন্ধান জানি আমি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ উইল বুড়ো বাবা আপনার নামেই হবে....কথা শেষ করেই কোটের পকেটে হাত দিলো মিঃ বিশ্বাস।

পেছন থেকে শিখ ড্রাইভার বললো–বিশ্বাল আপনার কোটের পকেট শূন্য। ওটা যখন আপনি গাড়ির মধ্যে খুলে রেখেছিলেন তখন আমি বের করে নিয়েছিলাম কাজেই......শিখ ড্রাইভারের কণ্ঠ নারীকণ্ঠ, অবাক হলো মিঃ বিশ্বাস। কিছু বলতে চাইলো কিন্তু বৃদ্ধ সে সময় দিলো না।

বৃদ্ধ নিজ পকেট থেকে একটি রিভলভার বের করে চেপে ধরলো মিঃ বিশ্বাসের বুকে। তারপর শিখ ড্রাইভারটিকে লক্ষ্য করে বললো–রাণী, একে হত্যা করে তোমার হাত কলংকময় করোনা। বহু পাখিকে আমি হত্যা করেছি কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে মিঃ বিশ্বাস। সরলপ্রাণ মিঃ রিজভীর শুধু সে সর্বনাশই করেনি তাকে নিঃস্ব করেছে, তার মেয়ে মাসুমাকে হত্যা করেছে। নিষ্পাপ মাসুমা কলঙ্কিত জীবন নিয়ে আর ফিরে আসতে চায়নি। সে সলিল সমাধি লাভ করেছে,

চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন মিঃ রিজভী-আমার মা-মনি মাসুমা নেই মা নেই....তবে যে বিশ্বাস বললো।

মিথ্যা কথা! জনাব রিজভী, এই নিন রিভলভার, আপনার সর্বনাশ যে করেছে তাকে নিজ হাতে উপযুক্ত শাস্তি দিন।

বিশ্বাস পালাবার পথ খুঁজছিলো।

বৃদ্ধ বুঝতে পারে, অট্টহাসি হেসে বললো–এক পা নড়েছো কি মরেছে। বিশ্বাস, আমি প্রথমে তোমাকে চিনতে পারিনি। আরাকান বিমান বন্দরে যখন তোমাকে দেখেছিলাম....

মিঃ বিশ্বাস বলে উঠলো–তুমিই তাহলে সেই ব্যক্তি আমার জাহাজে হেলিকপ্টার নিয়ে......অবাক চোখে তাকালো বিশ্বাস বৃদ্ধের মুখের দিকে।

রাণী বলে উঠলো বনহুর, আর সময় দেওয়া যায় না। বলো শেষ করে দেই......

না, একে কুকুরের মত হত্যা করবেন, জনাব রিজভী।

আমার হাত কাঁপছে, আমি পারবোনা। পারবো না….আমার মা-মনি মাসুমাকে যে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে তাকে তোমরা হত্যা করো, আমি দেখবো… আমি দেখবো ওর বুকের রক্ত মানুষের রক্তের মত লাল কিনা।

রাণী বলে উঠলো–বনহুর, এখনও তোমার রিভলভার শব্দবিহীন রয়েছে?

হ্যাঁ ভুলে যাচ্ছিলাম। মাসুমার করুণ মুখ আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলেছিলো…কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের হাতের রিভলভার গর্জে উঠলো।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মিঃ বিশ্বাস পোড়োবাড়ির অন্ধকার কক্ষে মুখ থুবড়ে পড়লো। হাত-পা নড়লো কিছুক্ষণ, তারপর স্থির হয়ে গেলো বিশ্বাসের দেহটা।

বৃদ্ধবেশি বনহুর রিজভীর সামনের উইলখানা মোমের আলোতে পুড়িয়ে দিলো, তারপর বললো–চলুন জনাব রিজভী, আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেই।

ওরা অন্ধকার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

মোমের আলোতে মিঃ বিশ্বাসের প্রাণহীন দেহটা অদ্ভুত লাগছে।

[পরবর্তী বই লীলা নাগের হীরক হার]

পূর্ববর্তী:

« ৮.০৯ বনহুর ও মাদাম বাঈ (২)

পরবর্তী:

৮.১১ লীলা নাগের হীরক হার »